দণ্ডিত আসামী

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

১লা বৈশাখ ১৩৬৫

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

যামিনীভূষণ উকিল

দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৯এ, বিধান সরণী

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

বন্ধুবর অনিল বিশ্বাস

ও

আমার যথার্থ এবং নির্মম সমালোচক

শ্রীযুক্ত কানাইলাল কর্মকারকে

DANDITA ASAMEE

By

NIGURANANDA

A fiction from Subconscious mind

Price 6/-

আশ্চর্য দুর্গন্ধ! রঙের একটা রেখার মত নিস্তেজ হয়ে পড়া নরমটার উপর পুরুষাঙ্গ দিয়ে আঘাত করছে। জঘন্য! কুৎসিত! চারদিকে কী কঠিন কাঁসার মত তামাটে রোদ! ঝাঁ ঝাঁ করছে ইঁট।

আচ্ছা, ঐ যে চলে গেল মাথা নিচু করে, আমার সঙ্গে খুব ভাব ছিল না? এই তো, কিছু আগেই তো? বলেছিল না, আমি তোমাকে ভালবাসি? ভালবাসি বলেই বার বার আসি? আমাকে বের করে নিয়ে যাও? তুমি যদি একবার এই পাথরটা ফাটিয়ে বাইরে যেতে পার, তবেই আমি পেছনে পেছনে তোমার সঙ্গে যাব? অথচ…

—নমস্কার!

উঃ! কী আশ্চর্য নির্বিকার হাসি!

—নমস্কার!

কী লম্বাটে মুখ লোকটার! অথচ কী সুন্দর রুমাল দিয়ে মুছছে বার বার!

—নমস্কার! আপনি কি ব্যস্ত আছেন?

—না। বসুন।

কী দুর্বোধ্য লোকটা! সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত কলম দিয়ে তৈরি জামা। সরকারী বিজ্ঞাপনের মত হাসি। ঘোড়ার মত চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে বোধহয় হেসেই ফেললাম।

সে বলল, হাসবেন না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এবং ভাল করেই জানেন যে, সবই একটা বিরাট প্রতারণা। কিংবা ধরুন 'প্রতারণা' শব্দের যথার্থ মানে, আমি বা আপনি কেউ জানি না বা জানেন না। এর কারণ হয়তো এই যে, আমরা প্রতারণার মধ্যেই বাস করি।

আশ্চর্য! লোকটা ম্যাজিকও জানে নাকি? একটা শুকনো ভ্যাপসা ধোঁয়ার মত যেন বুকের ভিতর দিয়ে কথাগুলো চলে গেল। চারদিকটা ভয়ানকভাবে বিশ্রী লাগছে। পৃথিবীর বহু নিচ থেকে অসংখ্য প্রেতাত্মা উঠে এসে যেন নিঃশব্দ কণ্ঠে চিঁহি চিঁহি করছে। অথচ তারই মধ্যে লোকটা কী আশ্চর্যভাবে আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ করল দ্যাখো:

—আপনি যাই বলুন না কেন, আমার কিন্তু এখন এ-সব বেশ, মানে এই ফুলদানিতে প্রকৃতি, এই যে ওয়ারড্রোবের উপর দুটো অচল ঘোড়ার মধ্যে জীবনের, দেয়ালের ধড়হীন কয়েকটা নিষ্পলক, মহাকাশ থেকে তুলে আনা কাঞ্চনজঙ্ঘা, আলমারিজাত কিছু মানুষের নির্বাক, কয়েক ফর্মা গাণিতিক সচল স্তব্ধতা, এবং তারই পাশে খাজুরাহের ঐ আশ্চর্য পাথরের নরম, এবং অ্যাসট্রের পাশে পৃথিবীর নিত্যদিনের কিছু রূপরেখা, এবং এই যে ধরুন চোখের কিছু মোটা ফ্রেমের নিচে চিবিয়ে চিবিয়ে বিজ্ঞতা, এ-সব আপনার খারাপ লাগে? কিংবা হয়তো খারাপ, ভাল বা মন্দ এ-সব কিছুই নয়। এটা হল এক ধরনের আধুনিক অভ্যাস।

কাঁচা পেঁপের ডগার মত একটা সিগারেট থেকে রহস্যময় ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে, আবার আমার দিকে তাকিয়ে, প্রতিপদের চাঁদের মত হাসলো লোকটি। চোখ দুটো মিট্‌মিট্‌ করল। তারপর অ্যাসট্রেটাতে ছাই ফেলে বলতে আরম্ভ করল, আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই কখনও কখনও কোন ফাঁকে, একটু-আধটু···তাহলে বলুন, 'খারাপ' শব্দটা কি যথার্থই খারাপ? আসলে খারাপ মানেই কি ভাল নয়? যদি ধরুন, তা না হোত—তাহলে বেদের পর আর উপনিষৎ হোত না। এবং ধরুন রাজতন্ত্রের পর গণতন্ত্র, কিংবা গণতন্ত্রের পর সমাজতন্ত্র। এবং এইভাবে নিত্যদিনই তো রূপান্তর! এবং ঘুরে ফিরে শেষপর্যন্ত সেই এক জায়গায় ফিরে এলেও কি···? এই যে ধরুন নির্বিকার 'এক'—তার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন বিকার-টিকার···

লোকটা কি পাগল না কি, কে জানে! কিংবা হিপনোটিজ্‌ম বলতে যা বোঝায়, তাই কিছু? না হলে সূর্যটা এক চতুর্থাংশ আকাশে থাকতেও চারদিকটা এমন ধোঁয়াটে দেখব কেন আমি? ভাল করে যেন লোকটার মুখও দেখতে পাচ্ছি না। জীপের ফগ লাইটের মত চোখের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকাতে চেষ্টা করলাম তার দিকে। সিগারেটের ছাইয়ের মধ্যে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা আবার আমার দিকে তাকাল, তর্ক করতে চান? শঙ্করাচার্যকে এনে? বলব, তর্কটাও একটা বিকার। এবং তাহলেই একবার হিসেব করে দেখুন,—নির্ভেজাল ভাল বলতে কিছু নেই, সবই খারাপ। এবং খারাপ থেকে ভাল নামক সোনার পিতলে কলস পাবার জন্যেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই গতিময়তা। সুতরাং খারাপ সম্পর্কে আমরা যদি একটু অন্যভাবে···। কি একটা যেন বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেলাম। এবং ভুলে যাওয়া নাম মনে করতে গেলে যে ধরনের একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে, সেই-ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কি জানি, লোকটা অন্তর্যামী নাকি তাই বা কে বলবে! ঠিক আমার মনের কথাটা আঁচ করতে পেরেই যেন বলে উঠল, ওহ্! এ সমস্ত ঠিক এই মুহূর্তে আপনার কাছে, মানে এক্ষুনি ঠিক, এ-সব কিছুর জন্য আপনি, মানে কতকগুলি প্রশ্ন, এক দুই তিন করে আপনি যে মনের মধ্যে গুছিয়ে রেখেছিলেন,—মানে, সেইভাবে সব কিছু না হলে···। জানি, তাঁকেই সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ বলা হয়, যিনি স্বাধীন সত্তাকে এইভাবে পূর্বোক্ত ছকের মধ্যে, যাকে বলে গিয়ে লজিক,···হোহো হোহো, হাসালেন মশাই। তাহলে তো জগতের সব প্রাতঃস্মরণীয় লোককেই পাগল বলতে হয়, এ্যাঁ? এবং ফলটা কি তাহলে এইরকম দাঁড়ায় না যে, সুস্থতা অসুস্থতা দ্বারা, অসুস্থতা সুস্থতা দ্বারা, ভাল মন্দের দ্বারা, মন্দ ভাল দ্বারা, শয়তান ভগবান দ্বারা, ভগবান শয়তান দ্বারা, এবং পুরুষ প্রকৃতি দ্বারা, আর প্রকৃতি পুরুষ দ্বারা, জগৎ এইভাবেই চলে?

ভেতর থেকে অদ্ভুতভাবে গা গুলিয়ে উঠছিল আমার। মনে হচ্ছিল, সেই মুহূর্তেই বমি করে দিতে পারলে যেন বাঁচি। তা দেখে কি সামান্য একটু ঘাব্‌ড়ে গেল লোকটি? যেন চিরে যাওয়া গলায় অদ্ভুত একটা শব্দ করে উঠল, এ্যাঁ! আমি এভাবে কথা বললে, আপনি কি·? ঠিক আছে, যতটা সম্ভব আপনার সাজানো-গোছানো মানসিকতাকে – যাকে বলে গিয়ে মানবিক মানসিকতা···। আপনি বোধহয় ঠিক টেকনিকটা···অথচ দেখুন, টেকনিক, যাকে আমি এখানে বলব 'ফরম', অর্থাৎ 'ফরম' এবং 'কনটেণ্ট', প্রগতির নামে চিরকালই তো এ দুটো বড় স্টার্টিং পয়েণ্ট! তা কনটেণ্ট কতদূর পাল্টেছে, জানি না। তবে টেকনিক বেশ কিছুটা পাল্টেছে নিশ্চয়ই। মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে যাওয়া বুড়োরা যখন চেঁচামেচি করে, এবং সেই সঙ্গে বাপ-মায়ের সুবোধ সন্তানেরা, তখন জানবেন কিছু একটা হচ্ছেই।

ফিক্, ফিক্, ফিক্! আশ্চর্য! লোকটা হাসছে কেন? আমি কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব নাকি? আমার মনে হল, স্নায়ুগুলো কাঁপছে। মনে হল, চিৎকার করে উঠি, দোহাই, আপনার লম্বাটে মুখটাকে আমি চিনি না। দয়া করে চলে যান, আমি স্বস্তি বোধ করছি না। কিন্তু আমি যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছি। কিছুই বলতে পারলাম না। ফিক্‌ফিক্ হাসি শেষ করে নিজেই সে বলতে লাগল, যে বিদ্যে দ্বারা কিছুই জানা যায় না, তাকেই বলে অ্যাকাডেমিক, ডি. ফিল, ডি. লিট। শিক্ষার পরীক্ষাগারে ছাড়পত্র পাওয়া গর্ভস্রাব।

হে হে হে হে হে! সিগারেট থেকে এমন একটা ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল লোকটা যে, মনে হল একটা পরিপূর্ণ বিকেলই অন্ধকার হয়ে গেল। একটা নিরালম্ব মহাশূন্যের উপর আছি, এইরকম মনে হল আমার। রুমাল দিয়ে আবার মুখটা মুছল সে। মুখে দেখি দুর্বোধ্য রেখা। রুমালটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, হ্যাঁ, পয়েণ্টটার উপর জোর দিতে পারেন। যাকে জানা গেছে, তাকে কাঁঠালের মত

গিলে বদ্‌হজমের পর উগ্‌রে দেওয়ার নাম—থিসিস। জানা হল মূর্খতা। জনগণ যেটা অনেক আগে গ্রহণ করে, তাকেই অনেক পরে বুঝতে পেরে পণ্ডিতেরা প্রসব করেন ঢাউস। মুর্খ যেটা বুঝতে পারে, পণ্ডিত সেটা বুঝতে পারেন না, এটাই হল আধুনিক বকের যুধিষ্ঠির। টেক্‌নিক এবং কনটেন্ট পাল্টালেই পুরনো কাকের সন্ধ্যাবেলার বাঁশঝাড়।

কিছুক্ষণ সত্যিই বোধহয় আমার কোন জ্ঞান থাকল না। বুঝতে পারলাম না আকাশের কোন অংশে সূর্য, এবং পায়ের নিচে কোথাও সবুজ আছে কি না। মনে হল, আমি নই, আর কেউ যেন ফণী-মনসার ডাল থেকে কথা শুনছে। কয়েকটা কথা যেন অযথা হাওয়ায় ভাসছে—সোর্স? সত্যিই হল সোর্স, উৎস।

কে যে দিব্যি গেলে এত কিছু জিজ্ঞাসা করেছে ওর কাছে, কে জানে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম শুধু। এবং সেই মুহূর্তে ঠিক অকস্মাৎ আমারই চোখের মণির মধ্য থেকে বুঝি বেরিয়ে এল আর একটি মূর্তি। কেমন যে মুখ তার, আমি বর্ণনা করতে পারব না। সংবাদপত্রের পাতায় দেখা মিথ্যা সংবাদের মত একটা স্যাঁতসেঁতে ·· একটা পোষা কুকুরের মত ধোপদুরস্ত। প্রথম লোকটা তাকে তিন আঙুল দিয়ে কেমনভাবে যেন একটা ইশারা করে কাছে ডাকল। গলায় লম্বা একটা চেন আছে বলে মনে হল আমার। কিন্তু চোখে দেখা যায় না। লোকটার লেজও নেই। হাতের চাইতে হাতের আঙুলগুলো চলে বেশী। শুধু সেই আঙুল কয়টা দিয়েই আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে। আমার মনে হল, আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ছুঁয়েছি, কিন্তু অনুভব করতে পারলাম না।

প্রথম লোকটি নবাগন্তুকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ওর যা প্রফেশন, তাতে চোখ দুটো ওর দৃষ্টিহীন হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, ওর চোখদুটোকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্তরালবর্তী কতকগুলো

নির্দেশ। ধরুন, পৃথিবীর অদৃশ্য ভগবান, এবং তাদের কল্যাণেও হল বহু বিজ্ঞাপিত আঁতেল।

আমার বোধহয় জ্ঞান আর নেই। তা দেখে লোকটা বলল, থাক, যে-ভাবে ড্যাব্‌ড্যাব্‌ করে···। মানে, যে কথাটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তাই বলছি। সত্যকে জানবার দু ধরনের—ইনওয়ার্ড এবং আউটওয়ার্ড···। বিজ্ঞান বলুন, শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, সর্বত্রই আউটওয়ার্ড এখন প্রায়—'নো'। এবং সেইজন্যই প্রাচীন ভারতের দর্শনের মত আজকের শিল্পও—আত্মানং···।

নতুন লোকটা চুরুটে টান দিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল। সেই খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ শুনে আরো এক আশ্চর্য দৃষ্টিতে পুরনো লোকটা তাকাল আমার দিকে, সুররিয়ালিস্ট? পাখি? কথাটা যে কার মুখে শুনি জানি না, তবে শুনি। বলুন না, ব্যাপারটাকে তো খুব ভালভাবে, পরিষ্কারভাবে আপনি · মনের গভীরে একটা অদ্ভুত সত্তার, যার কার্যকারণ আমি আপনি, যারা ধরুন—বুদ্ধি এবং বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে ধরবার চেষ্টা···তারা ঠিক তেমনভাবে···হ্যাঁ, জানি মশাই, হয়তো বহু প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা, যা নাকি পাগড়ীওয়ালা মনুর ভয়ে খাটের নিচ থেকে একটা অসতর্ক মুহূর্ত পেলেই মাথায় ঘোমটা টেনে বাইরে আসে। শিল্প এবং সাহিত্য···

জানি না কোন শব্দ করেছিলাম কিংবা কথা বলেছিলাম। যেন আমি কোন একটা কিছুতে সাড়া দিয়েছি—এইভাবেই লোকটা আবার আমাকে বলতে আরম্ভ করল, বুঝেছি। কিছু কিছু হয়তো বা রপ্ত করেছেন। এবং সেইজন্যই আপনার ভাবসাবে ইডিয়টের মত জলো জলো···হ্যাঁ, ঐযে এসপ্লানেডের সরু গলিটার ভাঙা বাড়ির উঠোনে 'when lovely woman stoops to folly' এবং বাঁ হাতে চুল ঠিক করতে করতে একটা রেকর্ড চড়িয়ে দেয় গ্রামোফোনে!

নো, নো, নো। পিন্‌টা খুলে নিচ্ছি। নিজের বুকের মধ্যে নিঃশব্দ

একটা গান শুনতে পাচ্ছেন? সেইটেই তো আসলে আপনার সত্যিকারের···। দেখুন, দেখুন, কী আশ্চর্য পোড়ামাটি আকাশে। নিংড়ে এক ফোঁটা বৃষ্টির স্বরলিপি, কিংবা ধরুন সীসের মত আকাশ থেকে বৃষ্টির ধারাপাতও যদি নামে, কেমন জেলখানার গরাদের মতন মনে হয় না?

আমার মাথার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিগুলো কাজ করছিল কিনা আমি বুঝতে পারছিলাম না। কিংবা এতদিন আমি যা শুনে এসেছি, অথবা বলেছি, সবই আসলে একটা বিরাট রকমের ভুল! সত্য ঠিক এইরকমই হয়তো হয়। মনটাকে মাথার মধ্যে স্থিরভাবে বসিয়ে, বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটার মুখে একটা উজ্জ্বল আলো দেখলাম। একটা বন্দুকের গুলির মত অকস্মাৎ বাঁ হাতটাকে ওপাশের একটা ভাঙা বাড়ির কার্নিশে ছুঁড়ে দিয়ে সে কল্‌কলিয়ে উঠল, দেখুন, দেখুন, কী আশ্চর্য শুকনো বেড়ালছানার মত ছাতের আলসেয় শেকড়-ঝুলানো ঐ বিবর্ণ গাছের বাচ্চাটা! কী ব্যাখ্যাতীত রুগ্ন হাসি, দেখুন! এবং তারই পাশে দেখুন টবের কোলে দুধ খাচ্ছে মিনি ফণীমনসার ডিম। আর ঐ শিক ভাঙা জানালার ফাঁকে দেখুন, নীল-রঙ-শাড়ি-মেয়েটার ছক বাঁধা বীণার ঢাক্‌না অসংখ্য ইঁদুরের দাঁত কেমন করে কেটে কেটে দিচ্ছে। এবং দেখুন কেমন ধূসর জাল বুনছে তারই উপর বড় বড় কয়েকটা মাকড়সা! অথচ তারই কত বিজ্ঞাপন!

তাকিয়ে দেখলাম, কোন্‌ একটা দুষ্টু ছেলে যেন ইতিমধ্যে পাত্‌লা রঙের হলুদ তুলি বুলিয়ে দিয়েছে সারা আকাশটাতে। রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফের তার, ডিজেলের ধোঁয়া এবং ছায়ার মত চলমান মানুষের মুখ, সর্বত্রই সেই হলুদের পাত্‌লা আস্তরণ। তারই মধ্যে সেই দ্বিতীয় আগন্তুকটি কেমন যেন এক চোখে আমার দিকে একটুখানি তাকিয়ে দেখে সেই প্রথম আগন্তুককে একটা ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটাচি কেস্‌টা মুহূর্তের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে, মুখ বন্ধ করে

দিল লোকটি। এবং পরে চুরুট থেকে এমন এক গাল ধোঁয়া টেনে বাইরে ছেড়ে দিল যে, আমি পার্কের ঘাস, বাব্‌লা-ডালের ফুল, ট্রামের জানালা এবং মেয়েদের মুখের রঙ, কোন কিছুই আর পৃথক করে চিনতে পারলাম না। দুর্বোধ্য কড়া তামাকপাতার একটা অকারণ গন্ধ যেন মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে রইল। এবং তারপর একমাত্র আমার অনুভূতিহীন একটা অস্তিত্ব ছাড়া, চারদিকে আর যেন কিছুই থাকল না।

দুই

আমি ঠাহরই করতে পারছিলাম না কিছু। কোন একটা দিন, রাত্রিতে মুখ গুঁজে আবার কখনও ফিরে এসেছিল কিনা মনে নেই। কিছু মনে করতেও পারিনি আমি। যেন প্রচণ্ড প্রবহমান এক গতিহীন শাশ্বত অপরাহ্ণে দাঁড়িয়ে আছি। চোখের উপর দিয়ে কখন রঙ বদলেছে সেটা ধরাও যায়নি। আমার অর্থহীন চোখের দৃষ্টির সামনে অকস্মাৎ আবার দেখি সেই লোকটাকে। একচোখ দিয়ে হাসতে হাসতে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আশ্চর্য! আমার মনে হল, হাতে তার একটি মাত্র আঙুলই আছে। সেই হাতে হাত মেলাতে গিয়ে মনে হল, যেন প্রকাণ্ড একটা গর্ত। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় দেখি, লোকটা গিয়ে একটা বেঞ্চে বসল। উপরে একটা গাছ। আশ্চর্য গাছ, ছায়া নেই। গাছের প্রত্যেকটি পাতা মুখ ফাঁক করে বড় বড় মাছের মাথার মত ডিজেলের ধোঁয়া আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গিলছে। লোকটা যেন একটুকরো ভেজা রোদ দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আমার দিকে তাকাল: ঝোপগুলোর মাথায় ছোট ছোট গন্ধগুলোকে দেখুন, হাওয়ার তেল আর পেস্টিসাইড মেখে চোখে কেমন ছানি! ঐ যে দুই জোড়া জ্বলজ্বলে দুর্ভিক্ষ? আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়? এই গাড়িগুলো

যৌবনের মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, গাড়ি যখন ব্যক্তি-বিশেষের হয়, তখন যায় বৈকি! ঐ দুই জোড়া চোখের মণি দেখুন, পুজোর থালায় লিচুর মত। আর কিছু কিছু ঐসব চোখ দেখুন, মনে হয় ইস্পাত হতে পারত। যুবকটির পাশে ঐ ভয়ঙ্কর অনুর্বর বুক দুটো দেখুন, জীবনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় কেমন হাঁ করে আছে! কিছু মানবক দেখুন! ফুটবে বলে মনে হয় কখনও? আর ঐ যে ফেলে দেওয়া কিছু ভাঙা প্রশ্নবোধক টাইপ, বেঞ্চে বসে বিকেলের রোদ খাচ্ছে? ঘড়ির কাঁটার মত এই যে অসংখ্য পা, সবই দেখবেন প্যাঁকাটির। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না, সবই এই হাসপাতালটার জন্য কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে? সভ্যতা বোধহয় এতদিন বসে বসে হাসপাতালের পথ তৈরি করেছে।

কথা কয়টি বলে লোকটা কোন্ দিকে তাকাল, আমি কিছুতেই ঠিক অনুমান করতে পারলাম না। লোকটার কথা, দৃষ্টি, চাল-চলন, সবই কেমন যেন মহাকাশের মত বিশাল ব্যাপ্তিতে ভরা। তবুও তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। যেন সর্বত্রই সমানভাবে দৃষ্টি ফেলে বসে আছে সে। এবং আমার মনে হল, আশে-পাশের সমস্ত বাড়িঘরগুলোই বড় বড় হাসপাতাল। এবং সমস্ত লোকের দৃষ্টি যেন সেইসব হাসপাতালের দিকেই নিবদ্ধ। আমি ঠিক চিন্তা করতে পারছি কিনা, সেটা বোঝবার জন্য মাথাটা বার কয়েক জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে নিলাম। চোখ দুটোও বার কয়েক কচ্‌লে নিলাম। কিন্তু তাতে পারিপার্শ্বিকের সামান্য পরিবর্তন হয়েছে বলে আমার মনে হল না। আমি বোকার মত লোকটির মুখের দিকে তাকালাম।

লোকটির দাঁতগুলো তেমনই ধারালো। যেন ইস্পাত জ্বলছে। আর একবার তার আশ্চর্য চুরুটে বড় রকমের একটা টান দিয়ে খক্ খক্ করে বার কয়েক কাশল সে। তারপর হঠাৎ কি দেখল কে জানে, একটা বাচ্চা ছেলের মত চেঁচিয়ে উঠল, দেখুন, দেখুন!

আমি দেখলাম। সমস্ত বাড়িঘরগুলো যেন এক মুহূর্তে একটা বড় বাড়ির মধ্যে মিশে গেছে। দেখলাম, গাদাগাদি করে লাইন দিয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেই বাড়ির বড় গেটটার কাছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে তালি দেওয়া কয়েকটা করে থলে। লোকটা বলল, 'দেখুন, কী আশ্চর্য! কী পরিচিত দুর্গন্ধ! আরশোলার ঠ্যাং, ইঁদুরের লাদি, মরচে পড়া পেস্টিসাইড, এবং তারই পাশে দেখুন, কৃষ্ণচূড়ার মত বিজ্ঞাপন—স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা।' আমার বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটা একটা সিগারেট বাড়িয়ে ধরল। যেই সিগারেটটা হাতে নিতে যাব, মনে হল সমস্ত মানুষ উট হয়ে গ্রীবা তুলে তাকিয়ে আছে। অজস্র চোখে অপার বিস্ময়।

কিন্তু লোকটার চোখে কোন বিস্ময় নেই। সেই ব্যাখ্যাতীত হাসি। যেন কামড়ে দেবে এমন ভাব। অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করল সে। যেন তার মুখ থেকে সিনেমার বিজ্ঞাপনের মত ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকল সেই প্রশ্নটা—'কোনটা পছন্দ করেন?' কিছুই বুঝতে পারলাম না। সুতরাং যেভাবে তাকিয়ে ছিলাম, সেইভাবেই তাকিয়ে থাকলাম লোকটার মুখের দিকে।

—বুঝতে পারছেন না? আমি বলছি দারিদ্র্য এবং ঐশ্বর্যের কথা। কোন্‌টা ভাল লাগে আপনার? আমার তো মনে হয় ঐশ্বর্যের বিরাট একটা যন্ত্রণা আছে।

কথাটা কানে যেতেই আমি দেখলাম, আমার চোখের সামনে কালো গোঁপের বিশাল এক কোঁচাওয়ালা গেরুয়া। সেই গেরুয়ার ভেতর দিয়ে লোকটার কথা কানে আসতে লাগল—ঐশ্বর্য মানেই আপনি কখনো স্বচ্ছন্দ নন, মুক্তগতি নন, ভয় থেকে মুক্ত নন। যেমন ধরুন, আপনার প্রতি ঈর্ষাকাতর কোন লোকের হাতে খুন হবার ভয়, এবং সেই সঙ্গে ধরুন ইজ্জত হারানোর।

লোকটা শেষ কথাটুকু বলবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা পুলিশের গাড়ি গেরুয়াটা থেকে বেরিয়ে এসে আমার বুকের মধ্যে ঢুকে গেল।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম,—সেই সময় গেরুয়াটা জলভেজা বাতাসের মত নড়ে উঠল, এবং তারই ফাঁকে আবার তার কথাগুলো কানে এল—সমস্ত প্রয়াসটাই তো ধরুন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। কিন্তু আপনি স্বাধীন হতে পারলেন কোথায়, বলুন? বলবেন, ঐশ্বর্যও থাকবে, অথচ ঐশ্বর্যের জন্য মায়া থাকবে না···

বিশ্বাস করুন—কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রঙিন ধোঁয়ার মত কয়েকটা নরম রঙ চলে গেল আমার চোখের উপর দিয়ে: বুকে বর্ম, কাঁধে তূণীর, মাথায় মুকুট, হাতে ধনুক, ময়ূরের একটা পালক এবং হাতে দুই ঘোড়ার মুখের লাগাম। সেই রঙিন ধোঁয়াটা আমার চোখে মুখে কয়েকটা হাল্কা হাওয়ার চুল ছুঁইয়ে যেতেই আবার শুনলাম—ঐশ্বর্য এবং নিরাসক্তি একই সঙ্গে সম্ভব?

লোকটার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকাতেই দেখি—পকেট থেকে রুমালের মত একটা ক্রুশে ঝোলানো যিশুকে বের করে মুখ মুছল। তারপর প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, ইম্পসিবল! স্ুঁচের ফুটো দিয়ে উট গলতে পারলেও ঐশ্বর্যের ছিদ্রপথে নিরাসক্তির প্রবেশ অসম্ভব!

সেই কোঁচার মত গেরুয়াটা আমার চোখে মুখে এসে পড়ছিল। লোকটা দুই হাতে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, কিন্তু তাই বলে দারিদ্র্যও সুখের আকর নয়। ঐ যে, অনেককাল ধরে একদল লোক প্রচার করে চলেছে!

চশমা পরা একটা উটের মুখ কাঁচের জানালার ওধারে দেখি ঘাড় উঁচিয়ে আছে। লোকটা সেইদিকে দেশলাইয়ের একটা কাঠি ছুঁড়ে দিয়ে স্পষ্ট করে আমার দিকে তাকাল—অনেকে বলে, অভাবই কর্মের প্রেরণা। কিন্তু ভেবে দেখুন, শাশ্বত অভাব কি শেষপর্যন্ত সব প্রেরণাই নষ্ট করে দেয় না?

গেরুয়াটা দেখলাম আর নেই। লোকটার হাতের চুরুটটাই সব চাইতে বেশী উজ্জ্বল। লোকটা তার ধারালো দাঁত দুটো খুলে

আবার ভাল করে মাড়িতে সেঁটে নিল। দেখলাম, দাঁত দুটো তখন মানুষের দাঁতের মত ছোট। সেই দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো বেশ স্পষ্ট ভাবে শুনতে পেলাম—'ঘৃণা করতে বলুন, বুঝলেন, দারিদ্র্যকে ঘৃণা করতে বলুন। পভারটি ইজ ভেরি মাচ ফার্টাইল।' শেষ কথা কয়টি যখন সে বলল, আশ্চর্য একটা বিজ্ঞ মানুষের মত দেখাল তাকে। এবং আমি ঠিক ভাল করে তাকে যখন বিশ্লেষণ করে দেখতে যাচ্ছিলাম তক্ষুনি চোখের সামনে দেখলাম একটা মাথা ঝোলানো ক্রুশ, যার আড়াল থেকে দমকা ঝড়ের মত কথাগুলি ভেসে এল—মাপ করবেন, সমস্ত প্রচলিত সত্য ও আপ্ত বাক্যকে আমি ঘৃণা করি। দারিদ্র্য স্বর্গের পথকে প্রশস্ত করে এমন ধারণায় আমার বিশ্বাস নেই। বরং গভীর নরকে ঠেলে দেয়। দারিদ্র্যও নয়, ঐশ্বর্যও নয়, বরং আমি বলি—এ কেয়ারফ্রি এনজয়মেণ্ট অব্ লাইফ উইথ সেল্‌ফলেস ডিউটি!

হয়তো বা কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কারণ, আমার মনে হল—হয় আমার মাথার ভিতর প্রচলিত সেই যন্ত্রটা কাজ করছে না, কিংবা আমি সত্যি সত্যিই শুনতে পাচ্ছি এবং দেখছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

কিছুই বুঝতে না পারার মত অসহায়ত্ব বোধহয় মানুষের জীবনে আর নেই। তা দেখেই বোধহয় লোকটা বলল, আপনি নিশ্চয়ই এখানটায় ঠিক ফ্রি বোধ করছেন না? ফ্রি, ফ্রি, ফ্রিডম। অবশ্য ফ্রিডম, বণ্ডেজ সবই তো একটা রিলেটিভ টার্ম, কি বলেন? এক সময় আমি আমার পুরনো স্ত্রীর কাছ থেকে সরে গিয়েছিলাম, জানেন?

আমার চোখের উপর সঙ্গে সঙ্গে তিন লগ্‌গি আকাশে সূর্যের একটা সূর্যমুখী, কয়েকটা উঁচু দাঁত এবং ফেকাসে হয়ে আসা কিছু কালো চুল ভেসে উঠেছিল, যার মধ্য দিয়ে কাঁসার পাত্রের মত ঠন্ ঠন্ শব্দ বেরুচ্ছে। এবং তারই মধ্যে লোকটাকে সামান্য একটু বেঁকে

গিয়ে বলতে শুনলাম, কিন্তু পাহাড়ের চুড়োয় বসেও সূর্য দেখতে পাইনি আমি।

কথা কয়টি বলেই যেন বেড়ালে ইঁদুর দেখতে পেয়েছে এমনি ভাব করে লোকটা উঠে দাঁড়াল এবং টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে নেবার মত আমাকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। তার লক্ষ্য সামনে, এবং আমাকে সেখানটা দেখিয়ে বলল, 'চলুন, ওখানটায় বসা যাক।' এগিয়ে আসতেই একটা কাফে। তা দেখে সে শব্দ করে উঠল—বুলেটপ্রুফ কাঁচের ফাঁকে চায়ের কাপে কী নিঃশব্দ ঝড়, দেখুন! এবং কাউন্টারের ওপরে ঐ বেড়ালের মুখ! ঐ যে ছোট ছোট পর্দার খুপ্রীগুলো? কী হাল্কা ঢেউয়ের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের দুঃসহ নিরাপত্তা! ঠাণ্ডা কফি, কয়েকটা মুরগীর ঠ্যাংয়ে গরম চামচে, কিছুসংখ্যক রঙিন মেয়ের পাশে শুকিয়ে আসা সকালবেলার কয়েকটা কাগজ।

কোথায় একটা দরজা ছিল বুঝতে পারছি না, সেখান দিয়ে নিঃশব্দে আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল লোকটি এবং একটা টেবিলের পাশে গিয়ে বসল। এতক্ষণ দেখতে পাইনি, একটা সাদা কোট পরা শেয়ালের দুটো চোখ জ্বল জ্বল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমার, কিংবা লোকটার, কার দিকে উঠে দাঁড়িয়ে সে হাত বাড়াল, বুঝতে পারলাম না। দাঁতের বদলে জিব্ নেড়ে নেড়ে আশ্চর্যভাবে হাসল সে। আমি তাকিয়ে দেখলাম, সেই প্রথম দিনে দেখা দ্বিতীয় লোকটি। কিন্তু আমার সঙ্গের লোকটি তাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে, বড় একটা চুরুট দিয়ে ঘাড় মুছে, চেয়ারটাতে বসে পড়ল এবং পাশের চেয়ারটাতে আমাকেও বসাল। চেয়ারে বসেই সেই শেয়ালটাকে দেখে ভয়ানক ক্ষেপে গেল সে এবং যেন প্রায় চিৎকার করে উঠল, ইউ আর দি রিয়াল মার্ডারার্স। হ্যাঁ, বুঝলে, তোমরাই। এট্টিলা আর চেঙ্গিসের চাইতেও। কিংবা ভয়ানক গুণ্ডা। কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, হাসতে হাসতে তোমরা নাক

কামড়ে দাও। ঐ যে সেদিন একদল শিক্ষিত ফ্ল্যাগ আর ফেস্টুন, অবহেলিত একটা ইণ্টারভিউ পেল, এবং একটা নিয়মমাফিক প্রতিশ্রুতি, সঙ্গে সঙ্গে কিছু বোল্ড টাইপ এসে তোমাদের শিরোনামায় ঝাঁপিয়ে পড়ল—'সব দাবি মেনে নেওয়া হল'। এবং যখন বাব্‌লা গাছের নিচে বসে বুনো রামনাথ হল না লোকগুলো, সকলে তাদেরই তো ধিক্কার দিল! কী মোলায়েম আঘাত, চিন্তা কর!

সিগারেটের ধোঁয়ার মত হাসতে লাগল দ্বিতীয় লোকটা। কী আশ্চর্য! সামান্য মাত্র যদি হেরফের ঘটল তার মুখের রেখাগুলোতে! বরং একটা কফির কাপকে সে আরও শক্ত করে কামড়ে ধরল। আমার সঙ্গের লোকটা তার কফির কাপে কয়েক ফোঁটা নুন ছিটিয়ে দিয়ে আবার বলতে লাগল, বরং একথা তো তোমরা আড়ালে আড়ালে জান যে, সহজ প্রকাশযোগ্য হাতের কলমই সর্বাপেক্ষা কম জানা বেশী পাণ্ডিত্যে উজ্জ্বল। এবং সেই তোমরাই যখন প্রকৃত পাণ্ডিত্য এবং গুণের সন্ধান পাও, তখন নিদারুণভাবে তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন বা ধারালো নখের মত হয়ে ওঠ। তোমরা সবই জান, অথচ অপরকে জানতে দাও না যে, পৃথিবীর কিছু অদৃশ্য ভগবানের হাতের পুতুল তোমরা।

দ্বিতীয় লোকটার গলায় কফি ঠেকে গেল, অথচ বিষম খেতে খেতেও কী আশ্চর্য রকমে হাসতে লাগল! অদ্ভুত ধরনের এক মহৎ নীচুতা। তার সেই হাসির অর্থ খুঁজতে খুঁজতেই প্রথম লোকটা দেখলাম পকেট থেকে একটা বড় ট্যাবলেট বের করে মুখে ছুঁড়ে দিল। অতবড় ট্যাবলেট আমি বোধহয় জন্মাবার পর চোখে দেখিনি। ট্যাবলেটের বুকে যে ছাপ রয়েছে, মনে হল সেখানে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, 'কিলোগ্রাম' শব্দটা লেখা। ভয় পাচ্ছিলাম, বোধহয় সেই মুহূর্তেই ট্যাবলেটের ভারে পাল্লার একটা দিকের মত মাথাটা ঝুঁকে পড়বে লোকটার। আমি হাত বাড়িয়ে মাথাটা ধরতে গেলাম তার। সেই মুহূর্তে একটা কড়া রোদের মত

হেসে উঠে প্রথম লোকটা বলল, ট্যাবলেট খাচ্ছি। উই আর বর্ণ উইথ ট্যাবলেটস নাও। কফির সঙ্গেও ট্যাবলেট চাই আমার—স্যাকারিন। ভাববেন না, জীবনটাকে আমি আপনি সবাই তো এখন পকেটে নিয়ে বেড়াই, বুক পকেট, সাইড পকেট, সর্বত্র। না, না, আমার কোন অসুবিধে হবে না। আই ফীল কোয়াইট অ্যাট ইজ হিয়ার। কারণ, আমি এর স্বরূপটা স্পষ্ট করে জানি। এবং এখানেই তো ধরুন সেই মেয়েটি…

পর্দাটা সরিয়ে একটা মুখ উঁকি দিল ঠিক সেই মুহূর্তেই। দুটো লাল বিচির মত টলটলে চোখ, হাওয়া দিয়ে তৈরি একটা ধোঁয়াটে অন্ধকারের মত চুল, সমস্ত শরীরটা একটা ফটোর নেগেটিভের মত, অথচ তারই মধ্যে এক্সরে করা দেহের অভ্যন্তরের স্পষ্ট সংবিধান। এসেই মেয়েটি আমার পাশে বসে, লিপস্টিকে কী একটা ঘষে, জোর করে ঠোঁট দুটো ফাঁক করল। এবং সেই ফাঁক থেকে কোনরকম শব্দের বদলে বড় বড় কয়েকটা অক্ষর বেরিয়ে এল—'হ্যাঁলো!' তার গ্লীসারিন মাখা দাঁতগুলো আমার চোখের উপর রাখতে রাখতেই ব্যাগটা খুলল সে। সেই ব্যাগ থেকে ভক্ করে একটা গরম বাতাস বেরিয়ে এসে আমার নাকের ভিতর ঢুকে যেতেই দেখলাম—কয়েকটা বেতপাতা। সেই বেতের পাতায় একটা কাক আটকে গেল 'হুস' শব্দের তাড়া খেয়ে। এবং সেইটেকেই ধরতে এল একটা নীল ডুরে শাড়ি। এবং সেই নীল ডুরে শাড়িটা একথোকা মাখনের মত লেগে গেল আমার দুই ঠোঁটে। সেই মাখনের তালটাকে জিব দিয়ে চেটে ভেতরে নিতে যাব, দেখি একটা সানাই বাজছে, আর হলুদ নিয়ে গায়ে মাখাচ্ছে কার যেন এক ঠাকুমা। হিহি হাহা হুহু, কত শব্দ! একটা আমগাছের নিচে বসে এত কাঁদছি আমি যে, সেই চোখের জলে ভাসতে ভাসতেই ঠেকলাম এসে রেল স্টেশনে। তার দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে আসতেই দেখি, অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মত পিল্‌পিল্ করে হাঁটছে। তাদের মধ্যে অনেকেই মুখে মুখে শুঁড় দিয়ে কথা বলে

আবার এগিয়ে যাচ্ছে। একটা রিক্শার ধাক্কা খেয়ে বাথরুমে গিয়ে ছিটকে পড়তেই দেখি—বড়দা। বলছেন—'সার্টিফিকেটটা এনেছিস? অনেক লেট হয়ে গেল। চল্।' তারপরই একটা বড় বাড়ি। অসংখ্য রঙিন আঁচল আর বলিষ্ঠ জুতোর খটাখট। বেঞ্চে গিয়ে বসতেই মুখোমুখি হয়ে গেল একটা মেয়ের সঙ্গে—দুটো লাল ফলের মত টলটলে চোখ। নাক বাড়িয়ে চোখ দুটোর গন্ধ শুঁকতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তেই বড় বড় বকের মত আঙুলে আগন্তুক মেয়েটা আমার বুকের ভিতর খামচে ধরল। ভয়ানক অভিশাপ দিয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম,—তক্ষুনি সেই প্রথম লোকটা গরম চুরুটের ছাই ছুঁড়ে দিল আমার নাকের ডগার ওপর। তারপর প্যাট্ প্যাট্ করে দ্বিতীয় আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা কী না জান বল? বিশেষ করে খবরগুলো যদি স্ক্যাণ্ডালাস হয়, এবং কোনরকম ব্যক্তি, যারা পূর্বাহ্নেই তোমাদের কাগজের অন্তত কোন কলমের এক তৃতীয়াংশেরও অধিকারী, তাদের সঙ্গে যুক্ত কোন খবর নিশ্চয়ই তোমাদের দৃষ্টি এড়াবার নয়?

দ্বিতীয় লোকটার সিগারেটের ছাই থেকে যেন অসংখ্য দাঁত ঝক্ঝক্ করে ঝরে পড়ল। এবং সেই মুহূর্তে আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে, ক্যাবিনের পর্দাটা ধোঁয়ার মত জড়িয়ে ধরে আমার পাশের মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে গেল! আমার বুকের মধ্যে কোথায় যেন কেমন একটা গন্ধ আকুলি বিকুলি করতে লাগল। বকুল ফুলের মত কুড়িয়ে কুড়িয়ে তার অর্থ ধরতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চিন্তাটাকে জোর করে তুলে নিয়ে, নিজের পকেটে রেখে, লোকটা আবার দ্বিতীয় আগন্তুকের দিকে তার খন্খনে গলাটা ছুঁড়ে দিল—সেই যে কপিবুক মেয়েটি, দুই টান ভুরু, আলতো রেখার ঠোঁট, দুই পাফ্ মুখ, নকল মুক্তোর কান এবং গলা, রবারের বুক এবং দম দেওয়া মানসিকতা,—কেন, ভাল লাগছে না? এই যে টবের উপর কিছু সবুজ, জানালার ফাঁকে লাইট পোস্টের নকশা-কাটা নীল, মাখন-

তোলা হাওয়া, এসব জায়গায় এর চাইতে ভাল কোন···। হ্যাঁ, জান, এবং সেইজন্যই আই ফেল ম্যাডলি ইন লাভ উইথ হার—আই, দি ইনডিভিজুয়াল। এখনো বেশ মনে পড়ে। সেই যে সময়ের ছক বাঁধা উত্তেজনা, শুকিয়ে আসা স্নায়ুর চড়ুইছানার মত পাখা ঝাপটানো, বিবর্ণ রমণীয়তার ফুরিয়ে আসা গন্ধ, জুড়ে দেওয়া নিষ্প্রাণ নিতম্ব, এবং একমাত্র ব্যতিক্রম সীমিত ত্রিকোণের প্রাণস্পন্দন, বুঝলে, ব্যয়যোগ্য একটা নির্দিষ্ট সময় রোজই সে এখানে আমাকে ছেড়ে দিয়ে যেত। এবং তারপর যখন সুগন্ধি রুমালে নাক মুছে চলে যেত, মনে হত, সত্যিকারের একটা ডিটাচ্‌ড ভালবাসা—যার ব্যালান্স-সীট···দিস ইজ অ্যান আউটডেটেড সোস্যাইটি, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ?

লোকটার কথা যেন অনেকগুলো দিন—পেটের মধ্যে ধানের মত বসেছিল, কফির মত কিছু স্মৃতির উত্তেজনা অন্ত্রের মধ্যে গরম বালির মত গিয়ে পড়তেই ফুটে ফুটে বাইরে এসে ছিট্‌কে পড়ছিল। এবং বাইরে এসে ছিট্‌কে পড়েই আমার মুখের উপর কালো কালো মাছির মত তুর্‌তুর্ করে হাঁটছিল! হারানো দিনগুলোর মত নির্লজ্জ সেই মাছিগুলোকে হাত নেড়ে নেড়েও তাড়াতে পারছিলাম না। বিশ্রী একটা গরমের মত প্যাচ প্যাচ করছিলাম—ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটার চোখ দেখি প্যাঁচার মত গোল হয়ে গেল। বিজ্ঞাপিত মানুষের মত গম্ভীর ভাব করে সে তার গলার টাইয়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে যেন প্রেস রিপোর্টারদের সামনে বসেছে এমনি ভাব করে কথা বলতে লাগল। হঠাৎ আমার মনে হল, আমার সমস্ত বুদ্ধি, চেতনা, মানসিকতা সব যেন ঐ লোকটির মধ্যে চলে গেছে। আমার মধ্যে কিছু নেই। সমস্ত আমিটাই একটা বিশ্রী বমি বমি ভাব। একটা বিশ্রী টক গন্ধের মত ছুয়ারে পড়ে থেকে, আমি যেন আমার নিজের দিকেই তাকিয়ে থাকলাম, এবং আমার ও লোকটার মিশে যাওয়া এক অদ্ভুত ছায়া থেকে যেন কথা শুনতে লাগলাম। দ্বিতীয় লোকটাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো হচ্ছিল:

হ্যাঁ, আমার কাব্যের জন্ম এখানেই (আমার পরিত্যক্ত বিশ্রী অবশিষ্টটুকু এ কথার কোন মানে আছে কিনা সেটা বোঝবার জন্য ছেঁড়া মেঘের মত মগজ হাতড়াতে লাগল) হ্যাঁ, সেই যে তোমরা যার মধ্যে অসংখ্য অশ্লীলতা খুঁজে পেয়েছিলে? যৌন আবেদন ছাড়া ভালবাসা, এতে তোমরা বিশ্বাস কর? (আমার অর্ধচেতন অবশিষ্টের মধ্যে একটা বিষাক্ত হাওয়া যেন ধুঁকে ধুঁকে দেখতে লাগল, এরকম ভাবনা কোনদিন আমার মধ্যে ছিল কি না) আমি মনে করি, ভালবাসার যে চিন্তাতরঙ্গ, সেটাও একটা ফেনো-টাইপ। (আশ্চর্য! আমার মনে হল, আমি একটা বইয়ের পাতায় কালির অক্ষর হয়ে পড়ে আছি। এবং তারই মধ্যে আমার কিছুটা অংশ ছাগলের মত চপ্‌চপ্‌ করে আমাকে খাচ্ছে, এবং আমিই ঐ লোকটার মুখ দিয়ে খইয়ের মত ফুটে ফুটে বাইরে আসছি) আচ্ছা, সেই গল্পটা শোননি তুমি? লক্ষ্ণৌ-এর সেই যে চাঁদনী চকের গল্পটা? এক মেহমান গান শুনে পাগল হল একটি মেয়ের, কিন্তু চর্মচক্ষে দেখা পাওয়া যায় না তার, শুধুই আড়াল থেকে গান। মেহমানের যন্ত্রণার শেষ নেই। না দেখলে জীবন রাখা দায়। গেল অনুরোধ, উপরোধ, কিন্তু মেয়ে রাজী নয়। রাজী নয় এই কারণে নয় যে, মেয়েটার ভাল লাগেনি মেহমানকে। তাহলে? মেহমান বলল, আত্মহত্যা করবে সে। অবশেষে দেখা দিল মেয়েটি। কিন্তু হা হতোস্মি! যেমন সুন্দর তার গলা, তেমনি কুৎসিত তার মুখ। সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যা করল মেহমান। বুঝলে, সেইজন্যই বলি, ভালবাসা জিনিসটাই হল যৌন-বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত। ফিজিক্যাল বিউটি অলওয়েজ পারমিয়েট্স দি সেনসেশন অব্‌ অ্যাট্রাকশন। মহাপ্রাচীন পিতৃপুরুষ থেকে বয়ে আনা কৃত্রিম শাসনের চাপে মন খুলে কথা বলতে না পারলেও, এর চাইতে সার্বজনীন সত্য আর কিছু নেই যে, ভালবাসা অতৃপ্ত এক লতার মতন, আরও বেশী সৌন্দর্যের গা বেয়ে পরিতৃপ্তির আলো খুঁজে। এবং বুঝলে হে অদৃশ্য

পার্থিব ভগবানের হাতের আঁতেল, সত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর হল তোমার স্ত্রী। এবং তোমার স্ত্রীর মনের আকাশ থেকে যদি মনু-সংহিতার মেঘটা সরিয়ে দিতে পার, তাহলে দেখবে, নির্লজ্জ নক্ষত্রেরা সেখানেও ঠিক এমনি করেই হাসছে, ঠিক যেমন করে তোমার মনের আদিম সিংহটা বিচরণ করে বেড়ায়। এবং সেই জন্যেই আমি কথাটা বলেছিলাম যে, ভালবাসা যদি পুরুষ সিংহের শিকার হতে পারতো বহুসংখ্যক দুর্বলের রচিত সামাজিক গারদের বাইরে তাহলে, বোধহয় কফির চামচেয় মাপা রুগ্নতা থাকতো না। এবং তোমার বা আমার কারো জানালার চৌকাঠে কাব্‌লিওয়ালা বসে থাকতে পারতো না নিঃশেষ এক হিসেবের খাতা নিয়ে। এবং তাহলে পার্কের ঐ বাব্‌লা গাছটা হয়তো বা কৃষ্ণচূড়া হতে পারতো। এবং ভালবাসার জন্য একটা ব্যক্তিগত যন্ত্রণাও—

মনে হচ্ছিল, চেষ্টা করলে হয়তো এবার লোকটার কথা কিছু কিছু বুঝতে পারব। এবং সেইজন্য রুমালের মত একটা চেষ্টা দিয়ে মাথার ভেতরটা যখন মুছে নিতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটা জলের মত তার দুই চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ইস্পাতের মত জিব নেড়ে বলে উঠল, কি হল? কফিতে চিনি কম মনে হচ্ছে? বরং আর দু চাম্‌চে চিনি ঢেলে নিন। হ্যাঁ, এইভাবেই সচেতন চেষ্টাতে স্বাদ তৈরী করে নিতে হয়। আপনার কফির কাপে পৃথক একটা ব্যক্তি চিনি মেশাতে যাবে না। হয়তো বা আপনার কোন বান্ধবী বা স্ত্রী কিছুদিনের জন্য মেশাতে পারে, কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়। আপনার শরীরের চামড়াটা বাসী ফুলের মত হয়ে গেলেই কেউ আর কাপে চিনি মেশাবে না। সুতরাং সেই পুরনো সম্পর্কে আপনার পৃথক ব্যক্তিত্বকে আর আরাম দেবার চেষ্টা করবেন না, বুঝলেন?

ভাববার চেষ্টা করলাম, আমি বিয়ে করেছি কি না, আমার কখনও কোন প্রণয়িনী ছিল কি না। লাল ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে কখনও দুটো নিটোল লাউয়ের ডগা, বা স্নেহের আবরণে ঢাকা কোন

বিদ্রোহী লাউয়ের শিশুকে আমি দেখেছি কি না, কিংবা বিকেলের বাতাসের মত চুলে ঝুঁকে পড়া দুটি চোখ কখনও আমার কাপে সত্য সত্যই কোনদিন চিনি গুলে দিয়েছিল কি না। কিন্তু কাঁটা দিয়ে কুয়োর বাল্‌তি তোলার আগেই লোকটা আবার প্রজাপতির মত পাখনা নাড়তে আরম্ভ করে দিল—দেখুন, ঐ যে, ঐদিকে! ওটা বোধহয় কামরাঙা গাছ, উদ্ভিদবিদ্যার একটা দুষ্প্রাপ্য নমুনা! শহরের জাদুঘরে কী মূল্যবান সংরক্ষণ দেখুন! ওর আশ্চর্য সবুজ ডানা দেখেছেন? কী অবক্ষয়ী, এঁ্যা! আপনার নিজের ডানাটা খুঁজলেও এখন আর সেই সবুজের গন্ধ পান? কফি হাউসের জানালার উপর সবুজ, সত্যি কী আশ্চর্য দুঃসাহসী আক্রমণ! সত্য এখনও হয়তো বা মরে যায়নি।

সেই সবুজের আক্রমণ দেখতে দেখতেই লোকটা দ্বিতীয় লোকটির পকেট থেকে পেনটা টেনে নিয়ে আমার কপালে কী একটা যেন এঁকে দিল। আর সেই দ্বিতীয় লোকটি? টেনে ধরা রবার ছেড়ে দিলে যেমন হয়, তেমনি হয়ে গেল। মনে হল, প্রথম লোকটির চোখের মণি দুটো যেন স্মৃতির তরমুজ হয়ে গেল—এবং তার মধ্য থেকে লাল লাল রঙের অসংখ্য জমাট বাঁধা বিচি ঝর্‌ঝর্ করে ঝরতে লাগল। এক একটা বিচি যেন এক একটা শব্দ, আমি শুনতে লাগলাম: জানেন, আমার একদিন ভালমানুষ হবার ভারি ইচ্ছে ছিল। এবং আমি দীর্ঘ দিন সত্যই ভালমানুষ ছিলাম। আমার বাবার চোখে ছিল স্মরণাতীত কাল থেকে বয়ে আসা ভারতবর্ষ এবং মনু ইত্যাদি সমাজপিতাদের প্রাজ্ঞতা। আমার ঠাকুরমার ছিল রামায়ণ এবং মহাভারত। এবং আমার মায়ের মগজে ছিল মহা-প্রাচীন পিতৃপুরুষদের সংবিধান। সুতরাং বুঝলেন—ছোটবেলা থেকেই আমি ছিলাম সযত্নে রাখা গোল আলু। এবং মাটিতে অ আ ক খ লিখে তালপাতায় খাগের কলম চালাতেই হাতে এসে উঠে-ছিল একটা চিৎপুর—বাল্যশিক্ষা। কেন, আপনি পড়েননি? তাহলে

যথার্থই কোন শিক্ষা হয়েছে কি না সেটা ভাববার বিষয়। সেইটেই তো আসলে আপনার ঝামা ইঁটের ভিত! মনে করতে পারছেন না বোধহয়? আচ্ছা, মনে করিয়ে দিচ্ছি। সেই যে সব কথামৃতের মত আপ্তবাক্য? হ্যাঁ, আমি বলছি; বলছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আপ্তবাক্যগুলি আপনার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া তৈরী করে তার সিস্‌মোগ্রাফ রাখুন। রেডি, ওয়ান, টু,—খুব সতর্কভাবে আপনার মানসিকতাটাকে রেকর্ড করবেন কিন্তু—

আমার মনে হল, কোন বিরাট এক হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে জোর করে আমাকে শুইয়ে দিয়েছে কেউ। ঠিক চোখের উপর মেয়েদের ম্যাক্সি স্কার্টের মত বিরাট একটা সার্চ লাইট ঝুলছে, যার ভেতরে অসংখ্য গুঁড়ি গুঁড়ি ছোট বাল্‌ব। কেউ যেন নাকের উপর ক্লোরফর্ম চেপে ধরে বলছে—এক, দুই করে সব প্রতিক্রিয়াগুলো রেকর্ড করুন। রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি! লোকটা সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করে দিল এবং যেভাবে আমি কথাগুলো শুনলাম এবং নিজের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়াগুলো অনুভব করলাম, তা এই রকম:

লোকটি	আমি
১। বিদ্যা অমূল্য ধন।	১। এই অমূল্যধন পাবার জন্য আমি জীবনপাত করেছি।
২। কুবাক্য বলিও না	২। অদ্যাবধি কুবাক্য বলিনি। তবে মাঝে মাঝে লিখতে ইচ্ছে করে।
৩। কুলোকের সংস্রবে থাকিও না।	৩। আজ পর্যন্ত নেই। কিন্তু সুলোক কোথায় আছে?
৪। দরিদ্রকে আশ্রয় দান করিবে।	৪। সত্যিকারের কোন দরিদ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেছে বলে মনে পড়ে না।

লোকটি	আমি
৫। স্বীয় জিহ্বা শাসনে রাখিবে।	৫। রাখি। কিন্তু মনকে রাখতে পারি না।
৬। সাধ্বী নারী পূজনীয়া।	৬। আমার অনুসন্ধিৎসা যুবতী নারীর দিকেই বেশী। তাদের সবারই হাতকাটা হলুদ বা লালের ফাঁকে সাজানোগোছানো গোল গোল বিদ্রোহ দেখেছি।
৭। অন্যকে দ্বেষ করিও না।	৭। বাইরে করি না।
৮। সৎ পথ অন্বেষণ কর।	৮। যারা উপদেশ দেয়, তারা কখনও উপদেশ পালন করে না।
৯। বিল্বফল খাইতে সুস্বাদ।	৯। কটু। কিন্তু উপকারী।
১০। ভগ্নোৎসাহ হইও না।	১০। খবরের কাগজ দেখে ও রেডিও শুনে আশা টিকিয়ে রাখে বুর্বকেরা।
১১। কৃতঘ্ন হওয়া বড় দোষ।	১১। একালে কৃতজ্ঞ হয়েও কোন লাভ নেই।
১২। নির্ধনতা দুঃখের আকর।	১২। একমাত্র সত্য কথা।
১৩। দুর্ভাবনা ত্যাগ করা উচিত	১৩। একমাত্র হানাদার, যে কারো আঞ্চলিক সার্বভৌমতার মর্যাদা রক্ষা করে না।
১৪। সৎ পরামর্শ গ্রহণ কর	১৪। অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা সেই পরামর্শ দেন, তাঁরা নিজেরাই সেই পরামর্শ অনুযায়ী চলেন না।
১৫। চোরকে সকলে ধিক্কার দেয়।	১৫। একালে চোরই সকলকে চোখ রাঙায়।

লোকটি	আমি
১৬। নিয়ম লঙ্ঘন করিও না।	১৬। নিয়ম স্রষ্টারা একথা মানেন না।
১৭। ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হও।	১৭। কিন্তু আমার পয়সার বাতাসা, কলা আর সন্দেশ খেয়ে তিনি তার কোন প্রতিদান দেন না।
১৮। ধনবানেরা অট্টালিকায় বাস করে।	১৮। অতীব সত্য কথা।
১৯। কণ্টকময় পথে চলিও না।	১৯। তার মানে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন হাতে আন্দোলন কোর না।

এইটুকু হবার পরই, হঠাৎ যেন লোড শেডিং-এর জন্য রেডিওটা থেমে গেল। তাল কেটে যাওয়াতে চোখ খুলে বাঁদিকে তাকিয়ে দেখতে যাচ্ছিলাম, দেখি, লোকটা প্যাট্‌প্যাট্‌ করে হাসছে। কি হয়েছে কে জানে! মনে হল গায়ের ধুলো ঝাড়ছে। আমি মুখ খুলে কিছু বলবার আগেই নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সে আবার বলতে আরম্ভ করল, বুঝলেন, এই রকম আরো অনেক আছে। সব বলছি না। তবে এইগুলোই গিয়ে শ্রীচরণকমলের আশীর্বাদে আমার জীবনের মাটির তলায় ঝামা ইঁট। শেষ শব্দটা ঠোঁটের ফাঁক থেকে গড়িয়ে পড়বার আগেই লোকটার দুই আঙুলের ফাঁক থেকে একটা স্যাকারিনের ট্যাবলেট টুপ করে ঝরে পড়ল কফির কাপে। এবং সেই ট্যাবলেট ছোঁড়ার ঢেউ কাপের বুক থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই লোকটা আমার দিকে তার লাল টকটকে জিভটা নাড়িয়ে দিল: আরেক চামচে চিনির দরকার? আচ্ছা, ঠিক আছে। সুগারে ডায়াবেটিস হতে পারে? আমার কি মনে হয় জানেন, ত্রিশ অতিক্রম করলেই জীবনের প্রচলিত সত্য নতুন করে দেখা দিতে থাকে। নিজের বুকের মধ্যে ডুব দেবার সুযোগ আসে। হ্যাঁ, বলব, কি করে

সত্যিকারের সত্যের সন্ধান একদিন পেলাম। এবং এইখানেই, এই কফির টেবিলেই আমি তাকে পেয়েছিলাম। আমি, বুঝলেন, বাল্য-শিক্ষার নির্দেশ অনুযায়ী বিদ্যাভ্যাস করে কিছুটা ফল পেয়েছিলাম বলতেই হবে। একটা ভাল অফিসে চাকুরী পেয়েছিলাম। কিন্তু 'কাহারো দুর্নাম করিও না' নীতির প্রভাবে আর উন্নতি করতে পারিনি। এবং 'নির্লোভ হওয়া আবশ্যক' কথা অনুসারে ঘুষ নেবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তেমন কিছু করিনি। এবং অনুত্তর ত্রিশ বৎসর বয়স অবধি এসব বিশ্বাসের মূলে আঘাতও পড়েনি। এবং 'সুবোধ বালক' হিসেবে পঁচিশ বৎসর বয়সেই 'যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম' ইত্যাদি মন্ত্র আউড়ে মাঝারি ধরনের একটা মেয়েকে গৃহবধূ করে ঘরে এনেছিলাম।

লোকটা কফির কাপের তলানিটুকুতে পকেট থেকে রুমাল বের করে ভিজিয়ে, তাই দিয়ে মুখ মুছে নিল। আমি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখলাম—তার সবুজ সবুজ চোখের ভুরু যেন কোথাকার একটা হাওয়ায় নাচছে। সেই সবুজ ভুরুগুলো দেখতে দেখতে শুকনো খড়ের মত হয়ে গেল, এবং চুরুটের ছাই থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ লাফিয়ে উঠে মুহূর্তের মধ্যে সেই ভুরুদুটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। দেখলাম, কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে লোকটার। সেই ঘাম ছোট ছোট তামার পয়সার মত। গড়িয়ে পড়তে পড়তে অকস্মাৎ কোথায় সেই বিন্দুগুলি হাওয়া হয়ে গেল। অকস্মাৎ লোকটা মুখ ফাঁক করে হাসলো। আমার মনে হল, ঝুলন্ত একটা পাঁঠার বুক ছুরি দিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছে কেউ। এবং সেই বুকের মধ্যে ঝোলানো একতাল চর্বি তার দুই ঠোঁটের ফাঁকে। চোখ দুটো কচ্‌লে আর একবার ভাল করে তাকাতে গেলাম তার দিকে। কিন্তু দেখলাম, ঠোঁট দুটো তার নড়ছে। এবং সেই ঠোঁটের ফাঁক থেকে শব্দ বেরিয়ে আসছে, আর এক কাপ কফির অর্ডার দেব? আচ্ছা, থাক। হ্যাঁ, আপনি তো জানেন যে, যৌবনের এই সিংহমুহূর্তে যে ধরনের মেয়েই গৃহবধূ

হোক না কেন, তার সৌন্দর্য এসথেটিক দিয়ে বিচার হয় না, হয় উত্তেজনা দিয়ে। সুতরাং ধরুন, বছর পাঁচেক ভাল চলেছিল। কিন্তু তারপরই বহু ব্যবহৃত পুরনো স্ত্রীতে নতুন স্বাদ খুঁজতে গেলে যে বঞ্চনা অবশ্যম্ভাবী, তারই প্রভাববশত অকস্মাৎ আমি নিজের বুকের দিকে তাকাবার অবসর পেলাম। এবং দেখলাম,—মনের সত্য এবং অনুশাসনের সত্য এক নয়। টু এবাইড বাই এ সোস্যাল কোড মিন্‌স টু গো এগেনস্ট দি কোড অব্‌ হার্ট। এবং রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ যেমন আরো ভাল শিকার দেখলে অবাক হবেই, তেমনি আমিও অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম, বুকের মধ্যে আমার একটা চাতক পাখি এবং শহরের ফাঁকে সীমিত হয়ে আসা গ্রামের একটা শেয়াল। অবশ্য সেটা কিন্তু আর শেয়াল থাকে না যদি অন্যভাবে তাকে—

খক্‌ খক্‌ খক্‌। লোকটা একটা শুকনো হাসিও হাসলো, এবং তারপর জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বোধহয় খানিকক্ষণ আমাকে ভাল করে বিচার করে দেখল। ভয়ানক অস্বস্তিতে ঘেমে উঠছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে আবার তার কথা শুনলাম: হঠাৎ দেখলাম, জানেন, অবাক হয়ে দেখলাম—চোখের সামনে দিয়ে অসংখ্য মুরগি ঘোরাফেরা করছে। এবং মনে হতে লাগল—অনেকদিন এমন সব মুরগি, অনেকদিন কেন, কোনদিনই এমন সব মুরগি আমি খাইনি। আসলে আমি একটা লোভী শেয়াল, মুরগির পাশে চুপ করে বসেছিলাম। ভেতরে একটা অদ্ভুত উত্তাপ, গা থেকে কোটটা খুলে ফেললেই যেন—

অবাক হয়ে দেখলাম, লোকটার মুখ সত্যি সত্যিই শেয়াল কিংবা নেকড়ের মত হয়ে উঠেছে। অথচ চোখদুটো বোধিবৃক্ষের নিচে। টকটকে লাল জিবে অদ্ভুত একটা লালা। শেয়ালের মত একটা গন্ধও ভক্‌ করে নাকে এসে ঠেকল। কফির কাপের মধ্যেই বমি করে ফেলতে যাচ্ছিলাম—ঠিক সেই সময় লোকটার মুখ থেকে আবার শব্দ বেরুতে লাগল। লোকটার মুখের শব্দে একটা টক্‌ টক্‌

ভাব থাকলেও, বমি বমি ভাবটা কাটিয়ে দেয়। শুনলাম: ঐটেই আমার আসল রূপ, বুঝলেন। অত্যন্ত সৎ এবং ভালমানুষ হয়ে ঘুরে বেড়ানোটাই হল আমার গায়ের কোট, নিজেকে এবং সমাজকে দুয়েকেই ভাড়ানোর জন্য। এই সত্যটা যখন বুঝলাম, সেই সময়ই এই টেবিলে কফির চামচেয় চিনি মাপতে মাপতে তাকেই একদিন পেয়ে গেলাম, সেই যে দম দেওয়া মেয়েটি? ঘড়ির কাঁটার মত? কিন্তু সেই শুকিয়ে আসা ফুলের মধ্যেও এমন একটা গন্ধ ছিল যে··· তা থাকে, কি বলেন? নইলে এত লোক এত সব জেনে শুনেও—

লোকটা তার লম্বা নাকটা কুঁচকে কিসের যেন গন্ধ নেবার চেষ্টা করল। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার বুকের মধ্য থেকে একটা লাল শাড়ির আঁচল বেরিয়ে এসে লোকটার চুরুটের মধ্যে ঢুকে গেল এবং চোখের পাতাগুলো হাওয়ার মত নাড়িয়ে দিয়ে দুটো বাঁকা লিপস্টিক হাঁসের পালকের মত নরম স্বাদে আমার কপাল ছুঁয়ে ঝির্‌ঝির্ করতে লাগল। সেই অবস্থাতেই লোকটার কথাগুলো কানে আসতে লাগল আমার: আশ্চর্য! তারপরই আমার কি মনে হল জানেন? মনে হল, হোয়েন এন উওম্যান সারেণ্ডারস হারসেল্‌ফ, সি গেট্‌স হারসেল্‌ফ ফিনিস্‌ড। আমি একটা অদ্ভুত উদাসীনতা বোধ করি তার সম্পর্কে, আমার পুরনো স্ত্রীর মতন। এবং সেই সঙ্গে এই সত্যই আবিষ্কার করেছি যে, পৃথকভাবে আমার গভীর বুকের মধ্যে গ্রামের একটা শেয়াল আছে। সেই সময় বুঝলেন, আমারই চোখের উপর একদিন যখন আমারই ম্যানেজার একটা নরম মাংসের বাড়ন্ত মুরগিকে তার গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন, একটা সিংহ তখন গরর গরর করে উঠেছিল আমার বুকের মধ্যে। এবং বিস্বাদ মুখে টলতে টলতে আমি এসে উঠেছিলাম ঠিক এই কফি হাউসটাতেই।

এইটুকু বলেই লোকটা নিজের জিবটা খুলে গ্লাসের জলে ধুয়ে আবার মুখে পুরে নিল। কিন্তু তবুও তার জিবের সেই পিচ্ছিল

লালা এতটুকু ধুয়ে গেল বলে আমার মনে হল না। বরং সেই লালাগুলো যেন আগ্নেয়গিরির লাভা হয়ে গেল। কালী পুজোর ডাইনীর মত চোখদুটো তার জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগলো, এবং এইভাবেই তার কথা শুনলাম: জানেন, একটা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এইখানে বসে বসেই ভাবলাম, আমি জানি, ঐ ব্লাডি সোয়াইন কোথা থেকে টাকা পায়। মনে হল, সবটাই ফাঁস করে দেব। 'ঈর্ষা পোষণ করা অনুচিত' বাল্যশিক্ষার এই উপদেশ সত্ত্বেও আমার বুকের মধ্যে একটা নেকড়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল। এবং আমি অনাবৃত আকাশের বুকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম—জ্বলজ্বল করছে কতকগুলো ঈর্ষার চোখ—অ্যাজ ইফ ইন দি ফার্মামেন্ট অব্ হার্ট দোজ আর এভার ফিক্সড লিভিং লাইটস। এবং আমার সেই মুহূর্তেই মনে হল, আমি নিজেকে অত্যন্ত বেশীরকম প্রতারণা করেছি। তৎক্ষণাৎ মনে মনে কতকগুলো পরিকল্পনা করে ফেললাম। আচ্ছা, আপনি ক্লাস কনট্রাডিকশন এবং ক্লাস কো-অরডিনেশন কোন্‌টাতে বিশ্বাস করেন?

অকস্মাৎ লোকটা আমাকে এমনভাবে কথাটা জিজ্ঞাসা করে বসল যে, আমি কোনরকম কিছু ভেবে উঠতেই পারলাম না। মনের মধ্যে ইতিহাসের পাতাগুলো খুঁজে দেখবার জন্য ফড়ফড় করে আঙুল চালিয়ে দিলাম। কিন্তু কোন কিছু খুঁজে পাবার আগেই আবার তার কণ্ঠ শুনলাম: থাক। সময়মত খুঁজে দেখবেন। উপযুক্ত সময় না এলে ইতিহাসের পাতা খুঁজে পাওয়া যায় না। ইতিহাস আসলে স্থির একটা নীতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। তার এই গতিটতি যা-ই দেখুন না কেন, আসলে সবই দাঁড়িয়ে আছে সেই স্থির নীতির উপরই। সময়ের সংঘাতে নড়ে-চড়ে উঠলেও আসলে ইতিহাস দাঁড়িয়ে থাকে এক জায়গাতেই। এসব থাক। যা বলছিলাম— আমি চিন্তা করলাম, ম্যানেজারটা কখন বেহুঁশ হয়ে তার গ্যারেজের সামনে নামে। যদি—কিংবা এমন যদি হত, কিছুসংখ্যক সরকারী

নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে আমি একজন সেই ব্যক্তি—হু ইজ অথরাইজ্‌ড টু শুট এনি বডি হি থিংকস হার্মফুল ফর দি সোস্যাইটি ? সোস্যাইটি ! হার্মফুল ! হি হি হি হি, কে আমাদের পক্ষে হার্মফুল নয়, বলুন ? আসলে আমাদের এই বর্তমান সমাজটাই হল সবচাইতে আর্টিফিসিয়াল ব্যাপার। কতকগুলো দুর্বলের ষড়যন্ত্র। কয়েকদিন ধরে আমি এইসব ভাবছি, জানেন। বর্ষায় ভিজে কয়লার ধোঁয়ার মত ভাবনাটা শুধু ঘোরাফেরা করছে। ভেবে দেখুন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি মাত্রেই প্রত্যেকে এক একটা বড় রকমের ডিকটেটর, টেম্পারমেণ্টালি এ গ্রেট টাইরাণ্ট। প্রত্যেকেই চায় তার পরিবেশের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য এবং সেই সঙ্গে সেই ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতাকে হাটিয়ে দেবার জন্য নির্মম ঘাতক হতে। সেইজন্যে বুঝলেন, আমরা পৃথক পৃথক-ভাবে প্রত্যেকেই এক একটা খুনী।

আমার বুকের ভেতর থেকে অকস্মাৎ একটা লাল রুমাল টেনে বের করে টেবিলের উপর রাখল লোকটি। ঐ একটা রুমাল যে এতদিন কোথায় ছিল, আমি নিজেই তা জানিনি। অবাক হয়ে হাত দিয়ে রুমালটা টেনে তুলতে যাব, আমার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল সে। বলল, ওরকম রুমাল আপনার অনেক আছে, পরে খুঁজে দেখবেন। যে-কথাটা বলছিলাম, শুনুন। হয় আমাদের খুন করতে দিতে হবে, নয়তো মনের এক গভীরতর ইচ্ছাকে টুঁটি চেপে শ্বাসরুদ্ধ করতে হবে। যে-ভাবেই হোক, পৃথক পৃথকভাবে খুনের দায় আমাদের প্রত্যেকেরই। এবং এখানে আইন কৃত্রিম বলেই সভ্যতা রুগ্ন। ইউলিসেসের জানালার চৌকাঠে তাই ইহুদি মহাজন বসে থাকতে পারে।

এ-ধরনের কথা জন্মে আগে আমি কখনও শুনিনি। তাড়াতাড়ি বুকের বোতামগুলো খুলে ভেতরে তাকাবার চেষ্টা করলাম। পুরনো কাগজের মত বিশ্রী কয়েকটা মুখ—মনু, পরাশর ইত্যাদি ফড়ফড় করে ছিঁড়ে উঠে এল। তারপরে আরো যে কত অসংখ্য আবরণ !

তার নিচে কোথায় যে সত্যিকারের একটা মন আছে, খুঁজে হদ্দি হয়ে গেলাম। রীতিমত ঘাম ঝরতে লাগল। মনে হল, কলার মোচার মত এ প্যাঁচ অসংখ্য। এবং খুলতে খুলতে শেষপর্যন্ত হয়তো আর কিছুই থাকবে না। মনে হল, একটা মানুষ আর কিছুই নয়, অসংখ্য পুরনো কাগজে জড়ানো একটা অস্তিত্ব মাত্র। অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলাম।

সিগারেটের ধোঁয়ার মত লোকটার দৃষ্টি কেমন নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছিল। কি খুঁজছিল কে জানে! তবে আমার দিকে যে তার দৃষ্টি ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাহলে আমার অস্তিত্ব লক্ষ্য করে কোন না কোন উচ্চবাচ্য সে করতই। কিন্তু সে-সব না করে, নিজের সেই কিছুকাল আগের কথারই রেশ টেনে সে বলতে লাগল, বিশ্বাস করুন, আমার জীবনের এটা একটা বেদনাদায়ক আবিষ্কার। এবং তারপর থেকেই আমি নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করেছি। এই যে আমি, আমি একটা মানুষ, আমারই এই উপাদান দিয়ে গড়া, ধরুন আপনি, রাম, যদু, মধু, সব। এবং তাহলে, পৃথক পৃথকভাবে যদি ব্যক্তিত্ব থাকে, খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে—এই ধরুন না, আমি নিজের মধ্যে যা পেয়েছি, আপনিও যদি গভীরভাবে হিসেব-নিকেশ করেন, তাহলে কি—হ্যাঁ, জানি, কিছুসংখ্যক লোক আছেন যাঁরা এর জন্য একটা পথ বাতলাবার চেষ্টা করেছেন। অহিংসা এবং ভালবাসাটাই শেষ কথা নয়, আসলে এর মাধ্যমেই মনকে এমন একটা স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, যেখানে নিজেকে সম্পূর্ণ ডিটাচ্‌ড—যাকে বলে নিরাসক্ত, তাই করা যাবে। হ্যাঁ, এইসব দর্শনের মূল কথা তাই নয় কি? ঐ যে সেই নির্বাণ-টির্বাণ, সে তো এইভাবেই—

শ্রীকৃষ্ণ, গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর, এই ধরনের কিছু কিছু চিত্র চোখের উপর দিয়ে একটা ডিফেকটিভ রীলের মত কেঁপে কেঁপে গেল। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে দেখলাম—কারো মাজা থেকে নিচটা বেড়ালের

মত, কায়ে! লেজটা বাঘের মত বড়, একজনের দেখলাম—বাজ পাখির মত পা। এবং আশ্চর্য এই ধরনের একটা ছবি দেখে আমার এত ঘাম ঝরতে লাগল যে, পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালে ছোঁয়াতেই মনে হল, সব রুমালটা ঘন পাউডার হয়ে গেছে। এবং সেই পাউডার এত পুরু হয়ে আমার মুখের উপর লেগে গেল যে, আমার মনে হল, নিজের মুখটাকেই আমি আর কোনদিন চিনতে পারব না। এবং এই রকম অসংখ্য পাউডার আমার মুখে পড়তে পড়তে, জন্মলগ্ন থেকেই জড়িয়ে আছে। মনে হল, বুকের মধ্যে একটা নেকড়ে লেজ নাড়ছে। পাউডারের প্রলেপে প্রলেপে সেইটেই চাপা পড়ে গেছে আমার মধ্যে। আসলে যে-'আমি'কে এত কাল আমি চিনেছি, সেটা খাঁটি নয়। আমি যে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্বণ করেছি, ভেতরে বসে এই নেকড়েটাই সব গিলেছে। মনে হল, গৌতম বুদ্ধের গলাটাকে একটা মুরগির মত কামড়ে ধরে বসে আছে সে। হঠাৎ ডান চোখটা ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল। হাত দিয়ে চেপে ধরতে যাব, মনে হল একটা ঠ্যাং ঝুলছে, মহাবীরের ঠ্যাংয়ের মত, যোগাসনভ্রষ্ট একটা লম্বা পা। জোরে জোরে মাথা ঝেঁকে ঠ্যাংটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঠ্যাংটা যেন লতার মত ঝুলে গিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরতে চাইল। ভয়ে চিৎকার করে উঠতে যাব, সেই মুহূর্তে দেখি, লোকটার নাক থেকে লাভা স্রোতের মত পরিমল নস্য বেরুচ্ছে। অদ্ভুতভাবে হাসছে সে। চোখে চোখে হতেই হুলো বেড়ালের মত একটু হেসে নিয়ে বলল, আপনি বোঝেন নাকি এ-ব্যাপারে কিছু, এ্যাঁ ? আচ্ছা, ধরে নিলাম বোঝেন এবং আপনার মনকে না হয় এইভাবে ডিটাচ্‌ড করেন, কিন্তু দেহ ? তাকে ডিটাচ্‌ড করতে পারেন ? অন্নজল, আলো বায়ু, সবই তো চাই। এবং তাহলে আর হিংসা এড়াতে পারলেন কোথায় ? কি বলেন, সমস্যাটা বেশ বড়, তাই না ? এবং সেই জন্যেই তো আশ্চর্য সেই

থিওরি—নিষ্কাম কর্ম। কর্ম করতেই হবে সংসারে থাকতে গেলে এবং তাহলেই ধরুন হিংসা এড়াবার উপায় নেই। আপনি জীবহত্যা না করতে পারেন, কিন্তু জীবনহত্যা আপনাকে করতেই হবে। সেই জন্যেই তো মূল কথা হল, কর্মের জন্য কোন আসক্তি থাকলে চলবে না। তাহলে, আপনিই বলুন না, আমার বাড়ির কুকুরগুলোকে আমি বারবার পরীক্ষা করে দেখেছি,—আশ্চর্য নিরাসক্ত। প্রবৃত্তির তাড়নায় খাবার নিয়ে মারামারি করে। কিন্তু পেট ভরে গেলেই আশ্চর্য নিরাসক্তি। একটা বিশেষ সময়ে যৌন উত্তেজনা, সময়টা চলে গেলেই উদাসীন। একটা বিশেষ সময়ের জন্য সন্তানদের প্রতি মায়া, তার পরই শঙ্করাচার্য। তাহলে কুকুরটাই কি প্রটোটাইপ হবে? আদর্শ? সভ্যতার সাধনা কি তাহলে কুকুর হবার সাধনা? যদি তা না হয়, তাহলে অদ্ভুত এক হিংসার উপরই আপনার প্রতিষ্ঠা, অদ্ভুত এক সর্বভুক কামনাই আপনার মৌলিক উপাদান। কিন্তু যদি সেটাকে যৌথভাবে···

দ্বিতীয় আর একটা লোক, সেই যে কোট গায়ে দেওয়া নেকড়েটা? এতক্ষণ যে পাশে পাশে ছিল সে-কথাটা মনেই ছিল না। আমার বুকের ভেতর প্রলেপের আড়ালে চাপা পড়া জানোয়ারটা প্রথম লোকটির কথা শোনবার পর ভয়ানকভাবে লেজ নাড়াচ্ছিল। সেই লেজের লোমগুলো আমার কলজের মধ্যে এমন ভয়ানকভাবে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল, আমার প্রলেপটা ধসে পড়া বাড়ির দেয়ালের মত ফেটে যাবে। গলা অবধি একটা বমি বমি ভাব ভয়ানকভাবে পাকিয়ে উঠছিল। মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে বমি উগরে দিতে যাব, দেখি সেই দ্বিতীয় লোকটা বসে। গলার টাইটাকে দুই হাতে বেশ পরিপাটি করছে। তাকে দেখেই বুকের ভেতর আমার লেজ নাড়াটা বন্ধ হয়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে বমি বমি ভাবটা আরও বেড়ে গেলেও তাকে আমি কোন রকমে দমন করলাম।

প্রথম লোকটাকে দেখলাম দ্বিতীয় লোকটার কানের মধ্যে আঙুলের টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ফেলল। দুষ্টু ছেলের মত মাস্টারের হাতে ঝুলে দ্বিতীয় লোকটা যখন মুখ বাঁকাতে যাবে, ঠিক সেই সময় প্রথম লোকটা বলল, এই ধর গিয়ে তোমাদের রিপোর্ট, এরও মধ্যে কি একটা বড় রকমের ঈর্ষা বা প্রভুত্ব কামনা নেই? যাকে তোমরা বিজ্ঞাপন দিয়ে তুলে দিলে, তার বিনয়াবনত কৃতজ্ঞ ভাবটা পুরুষত্ব যারা অর্জিত, এইটেই কি তোমার গভীর মনের আসল চেহারা নয়? এবং ধর, কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কাছে তোমরা যখন বাহ্যত বিনয়ের ভাব নিয়ে যাও, তার অন্তরালেও কি এই চিন্তাটা কাজ করে না যে, তুমিও একটা কেউকেটা ব্যক্তি? তুমি তাঁকে বিচার করতে পার বলেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছ? তুমিও কোন অংশে কম নও? এবং আমি অনেক সময়ই ভেবে দেখেছি যে, অধিকাংশ লোকের সঙ্গেই আমি যখন বিনয়ের ভাব করি, বস্তুত সেই সময়ই তাদের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য···উপনিবেশ-বাদ বুঝলে। প্রত্যেকেই আমরা পৃথক পৃথকভাবে এক একটা বড় বড় ঔপনিবেশিক।

কোথা থেকে একটা ছায়া এসে যেন দেয়ালে একটা আফ্রিকার মানচিত্র টানাতে যাচ্ছিল। ইদুরের মত বড় বড় নৌকো চারদিক থেকে মানচিত্রটাকে ঘিরে ধারালো দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে। একটা হলুদ রোদ মানচিত্রটার উপকূল দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। নাক বাড়িয়ে সেই রোদটাকে শুঁকতে যাব, হঠাৎ প্রথম লোকটা বলে উঠল, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা রোদ এসে পড়েছে, দেখেছেন? পুলিশের এত খবরদারি সত্ত্বেও কোথা দিয়ে পালিয়ে এল, তাই ভাবছি। ম্যালনিউট্রিশনে ধুঁকে পড়া ঐ কোঁকড়ানো পাতাগুলোর ফাঁকে একে দুঃসাহসই বলতে হবে, কি বলেন? আগামী ইতিহাসের মলাট খুলে উঠে আসা এই রোদটাকে দেখুন, পার্কের বিবর্ণ ঘাস-গুলোর উপরও পড়েছে। চলুন, বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। নতুন

সেপাইয়ের মত বিকেলের হাওয়াও এসে গেল মনে হচ্ছে। এই ধরণের রোদের মধ্যে স্মৃতিরা কেমন সাঁতার কাটে না? চলুন বাইরে গিয়ে দাঁড়াই, চড়ুইয়ের মত রোদটা হয়তো এখনই পালিয়ে যাবে। বিবর্ণ ঘাসের বুক খুঁটে এখন ও হয়তো কিছুই পাবে না। সতর্ক ঐ রোদটার কাছে যাই, আসুন।

তিন

কোথা থেকে হঠাৎ কখন এখানে এলাম জানিনা। কিংবা এখানেই ঘুমিয়ে ছিলাম, কে বলবে। চোখ মেলতেই দেখি, পায়ের উপর পা তুলে সেই প্রথম লোকটা চুরুট ফুঁকছে। আমার সঙ্গে চোখে চোখে হতেই বাঁ হাতের তর্জনীটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ঐ ব্যাঙের ছাতাগুলোকে দেখুন! শুকিয়ে এবং পচে যাওয়া কয়েকটা গাছের গুড়ি থেকে উঠেছে। আশ্চর্য! কি বলেন? নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণের আবির্ভাব। এবং কী আশ্চর্য প্রাণ দেখুন, সূর্যের কাছে যার ঋন সরাসরিভাবে সব চাইতে কম! এবং অফিস ফেরৎ এই যে ঘড়ির কাঁটার মত মানুষ···

আমার মনে হল, সত্যি অসংখ্য পা, পা-পা করে এগিয়ে চলেছে শুধু। হাত নেই, ধড় নেই, মাথা নেই, শুধু অসংখ্য পা। পিপড়ের মত পিল্ পিল্ করে পায়ের মিছিল চলেছে। আর চতুর্দিকে কেমন একটা একটানা শব্দ· সেই একটানা আশ্চর্য শব্দে মাথাটা গুলিয়ে যেতে চায় যেন। কোথা থেকে এবং কেনই বা এত পা, ভাবতে যাচ্ছিলাম, সেই মুহূর্তে লোকটি বলল, মহুয়া বনের মাথার মত ঐ যে বিশৃঙ্খল গুঞ্জরণ, এর কোন অর্থ আপনার কাছে ধরা পড়ে? আমি এই সব ভাবি, জানেন, এবং কেন যেন সেই জন্য আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি পৃথক পৃথক মানুষকে। ঐ যে সব মুখ, দেখুন, কেমন অদ্ভুত ব্যাঙের ছাতার মত। কোন ধরণের, কোন কিছুর প্রভাব দেখতে

পান ? অথচ সবই কেমন নেকড়ের মত ধারালো। একটা পাগলাটে ধরণের প্রবৃত্তি যেন কামড়ে কামড়ে নিয়ে চলেছে।

এতক্ষণে আমি অসংখ্য পায়ের উপর কিছু ধড় এবং মুণ্ড দেখতে পেলাম। কিন্তু ভাল করে তাকিয়েও মুণ্ডগুলোর কোন স্পষ্ট রূপ বুঝতে পারলাম না। কিন্তু লোকটা তারই মধ্যে কি দেখতে পেল কে জানে। বলল, এই সব মাথাগুলো সব চাইতে অকৃতজ্ঞ, ব্যাঙের ছাতার মত। অদ্ভুত এক সাম্রাজ্যবাদ মনের মধ্যে—আমি, আমি আমি। ঈর্ষা, ঘৃণা, আত্মস্বার্থপরতা, এই হল মৌল উপাদান। এবং এইজন্যেই আমি এই সব একক মানুষকেই ঘৃণা করি সব চাইতে বেশী। যেমন এই সব মানুষও প্রত্যেকেই প্রত্যেককে করে। অথচ কী আশ্চর্য দেখুন, আমরা প্রত্যেকেই এই সব মানুষেরই এপ্রি-সিয়েশন খুঁজি।

ট্রেজারীর কয়েকটা বাঁ-হাত, কেরাণী পাড়ার অফিস-টেবিলে কয়েকটি দাবার ছক, কয়েকটা ছেড়াপাঞ্জাবী গায়ে মাষ্টারের বসে যাওয়া চোখ, কাদা ছিটিয়ে যাওয়া মোটর গাড়ির মধ্যে মোমের আঙুলের ফাঁকে একটা বই, মরশুমি ফুলের মত মানুষের ময়দানে একটা বক্তৃতার মঞ্চ, ত্রিকোণ চিত্রের মত এই সব মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল। সেই চিত্রের আড়াল থেকে আবার যখন সেই প্রথম লোকটির মুখ বেরিয়ে এল, তখনও তার ঠোঁট দুটো নড়ে চলেছে :

অথচ, এইসব মানুষেরই এপ্রিসিয়েশন কেন খুঁজি, তাই আমি ভাবি, জানেন। আসলে এপ্রিসিয়েশনই হল একমাত্র বাইরের আলো যা নাকি আমাদের একক জীবনের গরাদের ফাঁকে ভিন্নলোকের ইশারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আরও বেশী সাম্রাজ্যবাদ তৈরী করার জন্য। হ্যাঁ, হিসেব করে দেখলে তো আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা প্রত্যেকেই এককভাবে বন্দী। আপনি আপনার চতুর্দিকেই অসংখ্য মানুষ দেখেন, অথচ তাদের সঙ্গে সত্যিকারের আদান-প্রদান

অসম্ভব। কেউ কাউকে বোঝে না। বোঝে কি? এবং সেইজন্যেই বার বার ঘুরে ফিরে সেই নিজের কাছেই এসে কেমন আহত হয়ে কাতরানো! সকালের থলে, নিত্যদিনের কিছু মিথ্যে সংবাদ, আপিসের খড়্গা, দুর্গন্ধ ঘাম, বিনিময়ের অযোগ্য অপ্রয়োজনীয় অসংখ্য কথার টুং-টাং এবং তামাটে রোদের ভিতর দিয়ে সেই নিত্য পুরাতন ভাঙা দুর্গ, সেই পুরোনো স্ত্রী, কিছু সমস্যা, কলহ এবং কম্প্রোমাইজ। যুবতী নারীর ঋতুর মত নির্ঘণ্টিত প্রেক্ষাগৃহ এবং তারপর আবার সকাল, দুপুর, বিকেল। কিন্তু এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যটাকে যদি তাড়াতাড়ি ভেঙে দিতে পারি—

কথাগুলো শুনতে শুনতেই হঠাৎ সম্ভবত অকারণেই আমার নজর বার কয়েক চতুর্দিক জরিপ করে এল। কাউণ্টারের উপর প্লাস্টিকের রঙিন, বাইরের আকাশে তামাটে মেঘের বক্তব্যহীন ইস্তাহার, ছায়াছবির অলিখিত নাটক, রঙিন চুলে বাঁধা কিছু কিছু যৌবন, কিছু-সংখ্যক কথার রেকর্ড; এবং সবই যেন একটা অর্থহীন পদচারণা। অথচ দ্বিতীয় লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম—এ-সবের মধ্যেও চোখগুলো কাগজের ফুলের মত। খুব কষ্ট করে বারকয়েক এ-সব বোঝবার চেষ্টা করলাম। কেটে যাওয়া রেকর্ডের মত কিছুসংখ্যক অর্থহীন শব্দই উঠতে লাগল মাত্র, আর কিছু নয়। সুতরাং চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আবার সেই প্রথম লোকটির দিকে তাকালাম। হাসতে হাসতে লোকটি বলল, চেষ্টা করছেন? তা করতে পারেন। কিন্তু মুক্তি নেই জানবেন। হিসেব করে দেখলে দেখবেন, এককভাবে আমরা বন্দী, বন্দী, বন্দী। রমণী নারীর চাবিতে এই বন্দিত্ব ভেঙে পালাবার একটা অদ্ভুত নেশা করে দেখেছি। সে আর এক ধরনের বন্দিত্ব। না, না, অসংখ্য রমণীর মুখ, বুকের নরম, এবং অদৃশ্য কৌতূহল ···না, না, সবটাই একটা অভ্যাসের বৃত্তাকার লোহার গারদ। আপনি ভাবছেন, যদি বেরিয়ে যেতে পারেন? আকাশে হেলান দেওয়া হিমবাহে? শূন্য নীলের প্রতিবিম্বিত সমুদ্রে? কিংবা পাথরে

খোদাই-করা মানুষের স্বপ্নের দেশে? তাহলেই আপনি এই গারদের লৌহ শলাকা ভেঙে পালাতে পারবেন? না, না। নিজের বুকের ভিতরটাই একটু তাকিয়ে দেখুন না। সেপাইগুলোকে দেখতে পান না? বহু পরিচিত ঐসব অস্পষ্ট মূর্তিগুলোকে? একটা অভ্যাস, বুঝলেন। অর্থহীন প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, সম্মান, যশ, এপ্রিসিয়েশন। এ সবই মধ্যযুগীয় এবং একালের অবক্ষয়ী এক সমাজের ধারণা। আমরা কখনই মুক্ত নই জানবেন। ব্যক্তিগতভাবে মুহূর্তকালের স্বাচ্ছন্দ হল এক ধরনের প্যারোল।

শেষ কথাটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল, আমার গায়ের উপর কি এ একটা লতানো জিনিস এসে পড়েছে যেন। হাত দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিতে গিয়েই দেখি,—দ্বিতীয় লোকটা তার পকেট থেকে অফুরন্ত একটা রঙিন সুতো বের করছে তো করছেই। অদ্ভুত এক দ্রৌপদীর শাড়ি। লোকটা যেন গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠল। তা দেখে খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠল প্রথম লোকটি। বলল, যত চেষ্টাই কর হে, এককভাবে একঘেয়েমির এই দুর্গ থেকে মুক্তি নেই, কোন রকমেই মুক্তি নেই। এই দুর্গটার মেঝে খুঁড়ে শুধু যদি গভীর এক পাতালে যেতে পার, যেমন আমি প্রায়শই চেষ্টা করি, তাহলে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া একটা স্নিগ্ধতার মুখ নজরে পড়তে পারে। কিন্তু হলে কি হবে বাছাধন, ঐসব সতর্ক গোয়েন্দারা দেখবে সেখানে গিয়েও হানা দিয়েছে। সুতরাং এইভাবে একটিমাত্র ব্যক্তির চেষ্টায় মুক্তি নেই।

ক্রমশই যেন লোকটার কথা আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল। এখন আর কিছুই যেন বুঝতে পারছিলাম না। কয়েকটি ছেলে হাততালি দিয়ে কলকল্লোল করতে করতে চলে গেল। যেন ছায়া-পথের কয়েকটা বড় বড় নক্ষত্র ছুটে গেল পাশ দিয়ে। আমার বুকের মধ্যখানটা থেকে যেন মাধ্যাকর্ষণের একটা বড় টানে খানিকটা খাব্‌লে নিয়ে গেল ওরা। বুকের মাংসের খানিকটা ছিট্‌কে বেরিয়ে

যেতে গিয়েও, আবার কি কারণে যেন রেহাই পেয়ে গেল। কিন্তু সেই ফুলে ওঠা মাংসস্তূপের মধ্যে হঠাৎ আমার বড় ছেলের চোখ দুটো দেখে কেমন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে গোঙাতে গোঙাতে একটা রাজকীয় বাস এসে থামল সামনের স্টপেজটাতে। প্রথম লোকটা তা দেখে কেমন হাততালি দিয়ে উঠল খানিকটা, তারপর ডান হাতটা সেইদিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বলল, দেখুন, দেখুন, ঐ বাসটার পা-দানি বনাম সীটের মধ্যে ভয়ানক একটা সংঘর্ষ দেখুন। বাক্যের কী প্রচণ্ড বিস্ফোরণ!

তাকিয়ে দেখলাম, চোখ-না-ফোটা কুকুরের বাচ্চার মতন মাথা দিয়ে গুতিয়ে গুতিয়ে এক একটা লোক একে অপরের মধ্যে ঢুকে যাবার চেষ্টা করছে। দুঃসহ গরম। ভেতরের মানুষগুলোর কপাল থেকে গলে গলে পীচ ঝরছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন বলছে প্রত্যেকেই।

প্রথম লোকটা বলল, জানেন, আমি আমার নিজেকেই ঐ ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাই। এবং এই সময় আমার একটা দ্বৈত সত্তাকে—

ভিড়ের মধ্য থেকে আকাশ হতে ছিটকে-পড়া আগুনের মত একটা মেয়ে এসে টুপ্ করে পড়েছিল রাস্তার উপর। আমার দৃষ্টি চলে গিয়েছিল তখন সেইদিকে। একটা মর্তমান কলার মাথায় কচুরীপানার শেকড়ের মত কিছু অগোছাল কলঙ্ককে দুই হাতে ঠিক করতে করতে সে এসে বসল কিছু দূরের একটা বেঞ্চে! মাথার উপর একটা রুগ্ন ডালের গায়ে লেগে-থাকা কয়েকটা পোকায়-কাটা পাতা। মেয়েটা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একটা রঙিন পেন্সিল দিয়ে বারকয়েক ঠোঁট ঘষে নিল। দ্বিতীয় লোকটাকে দেখলাম, এক দৃষ্টিতে সেই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ বাদে একটা চোখ বুজে ফিক্ করে একটুখানি হাসল সে। তারপর বুক পকেট থেকে একটা গন্ধ বের করে ভাল করে মুখখানা মুছে নিল, এবং অবিশ্বাস্য-

ভাবে কোথা থেকে ইয়া বড় একটা সিগারেট বের করে টানতে লাগল। একটা বৃত্তাকার ধোঁয়া সেই সিগারেটের মুখ থেকে বড় একটা ফুলের মালার মত হয়ে সেই মেয়েটার চারদিকে ঘুর্ঘুর্ করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বরফের মত কয়েকটা দাঁত বের করে মেয়েটা চোখ নাচাতে লাগল। দ্বিতীয় লোকটার নাভির কাছ থেকে কোঁকোঁ একটা শব্দ শুনতে পেলাম। তারপরই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সে ছুটে গেল সেই মেয়েটার দিকে। বারকয় মেয়েটার চারদিকে ঘুরল সে। আমার নজরে পড়ল, পেছন দিকে শেয়ালের লেজের মত কি একটা যেন নড়ছে লোকটার। তারপরই মেয়েটার ঠিক পাশাপাশি বসে পড়ল সে এবং দুই হাতে তার বুকে ময়দা মাখতে লাগল। মেয়েটা আলতো করে দ্বিতীয় লোকটার মাথা ঠেলে নামিয়ে দিল তার কোলের উপর। তারপরই দেখলাম, পাঁজকোলা করে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে লোকটা চলে গেল ওধারে, রাঙচিতার একটা ঝোপের আড়ালে। আমারও নাভির কাছটাতে কেমন যেন গুর্গুর্ করে উঠল। একটা হুলো বেড়ালের মত চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল আমার। উঠে দাঁড়িয়ে সেইদিকে ছুটতে গেলাম। প্রথম লোকটা সঙ্গে সঙ্গে আমার জামার পিছনটা ধরে আমাকে থামিয়ে দিয়ে হিহি হিহি করে খানিকটা হাসল। তারপর বলল, উত্তেজিত হবেন না, একে বলে অ্যান্টি-ইন্টেলেকচুয়ালিজম। কিন্তু এটা কোন সমাধান নয়।

কিছু বুঝতে না পেরে প্রথম লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, এক শিশি ভিক্স ভেপোরাম আমার মাথায় ঢেলে দিল সে। মনে হল, ঝির্ঝির্ করে ফ্রিজ চলছে চুলের মধ্যে। বেশ আরাম বোধ করে আবার বসে পড়লাম। একটা খাকী রঙের চুরুটে আগুন ধরিয়ে প্রথম লোকটা আবার আমার দিকে তাকাল: হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমি আমার একটা দ্বৈত সত্তাকে···। সেদিন ঠিক এমনি এক ভয়ানক গুমোটের মধ্যে, অসংখ্য ভিড়ের চাপে আমি যখন

একটা নেকড়ের মত, ঠিক এইখানে, জানেন, এইখানেই, ঐসব অসংখ্য ছোট ছোট দুর্গে ফিরে যাবার জন্য পা-দানিতে দাঁড়ানো মানুষ, হঠাৎ নিজেকে মনে হল দু-ভাগ হয়ে গেছি। বাইরের পা-দানিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি—নেকড়ের মুখ। ভেতর থেকে কাঁসার মত আওয়াজ এল আমার কণ্ঠ দিয়েই—শালা শূয়োরের বাচ্চা, বোল্ শালা। বাইরের 'আমি'ও দেখি নাক কুঁচ্কে ধারালো দাঁত বের করে বলছি, এই রোখ্কে, শালা শূয়োরের—

পরস্পর কতকগুলি চিন্তা যেভাবে চলে, আমার মাথার ভিতর বোধহয় সব ঠিক তেমনভাবে কাজ করছিল না। কারণ, আমি লোকটার কথার মধ্যে কোনরকম সংযোগ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিংবা চিরকালই বোধহয় পৃথিবীতে এইভাবেই কথাবার্তা চলে। এতদিন হয়তো সেটা আমি বুঝতে পারিনি, এবার বুঝতে পারছি। কোন কথারই কোন অর্থ নেই, অর্থ আমরা নিজেরা তৈরী করে নিই, এইমাত্র। কিংবা কোন কালে এইসব কথার অর্থ ছিল, এখন আর নেই। অনেক বেশী অর্থ এইসব শব্দের মধ্যে ঠুসে দেওয়া হচ্ছে বলেই হয়তো শব্দের আর কোন অর্থ নেই এখন। কিংবা যে সমাজের জন্য এইসব শব্দ তৈরি হয়েছিল, সেই সমাজ এখন এত বেশী এগিয়ে গেছে যে, শব্দগুলো তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর দাঁড়াতে পারছে না। কিংবা শব্দের অর্থ বুঝতে গেলে এখন নতুন সমাজের দরকার।

কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারছিলাম না। এমন সময় আবার সেই প্রথম লোকটার কথা শুনলাম, কি ভাবছেন? এ ধরনের ভাবনা কখনও···এবং তারপরই যদি বাড়ি ফিরে গিয়ে রেডিওতে কোন ঈশ্বরের কণ্ঠ: মানুষের মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ত্রিকোণ লাল, বিশ্বপ্রেমের জন্য ওজন করা দলিল, এবং শান্তির জন্য মাপা মাপা উক্তি এবং তারপরই শূন্যতার নামে কোন বিজ্ঞাপিত কবির অর্থহীন প্রাণচঞ্চল শব্দ, এবং হৃদয়হীন হৃদয়কে

ছোঁবার জন্য অভিনয় এবং সেই সঙ্গে ভূমিকাসর্বস্ব পাণ্ডিত্যের স্বকীয়তা—

মনে হল, কানের কাছে গুন্‌গুন্‌ করছে একটা ভ্রমর। এবং দূরে আরো অসংখ্য ভ্রমর দল বেঁধে গুঞ্জরণ তুলেছে। শব্দ, শব্দ আর শব্দ; শুধু মাত্র শব্দ। শব্দের কোন অর্থ নেই। যে শব্দের অর্থ বোঝা যায়, তারও কোনো মানে নেই। নতুন করে নিজের বুকের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেন আরও বহু আবিষ্কার সম্ভব হল। যে-সব অর্থময় শব্দ মানুষ অনেক আগে ব্যবহার করত, সেইসব শব্দ খুঁড়ে খুঁড়ে বের করবার চেষ্টা করলাম মাটির নিচ থেকে। মহেঞ্জোদড়োর পুতুলের মত অসংখ্য শব্দ পড়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কোন অর্থই নেই তাদের। যেমন ধরুন গিয়ে, ছোটবেলায় কানের কাছে ঠাকুরমার সেই উপদেশ—'চুরি করা মহাপাপ', কৈশোরে ঠাকুর্দার কথা—'পরস্ত্রীকে মাতা বা ভগিনী বলিয়া জ্ঞান করিবে', কিংবা সেই ছোট্ট বইয়ের পাতায় লেখা বাল্যপাঠ—'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' এই সব। মনে হল, সত্যিই তো, এগুলো শুধুমাত্র শব্দ, এর কোন মানে নেই। যদি কোন মানে থাকতো, শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এক একটা চিত্রকল্প ভেসে উঠতো মনের মধ্যে। এ-সব ঠিক আধুনিক কবিতার মত। নিজে থেকে মানে তৈরী করে নিয়ে উপভোগ করতে হবে। সুতরাং পুরোনো ঐ বাক্য-গুলোকে আর একবার নেড়েচেড়ে তার আদিম অর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কেমন যেন নিষ্প্রাণ, কোন অর্থই ধরা পড়তে চায় না। ছোটবেলা তাহলে এই বাক্যগুলোকে কেন্দ্র করে আমরা মনের মধ্যে কি ধরনের চিত্রকল্প তৈরী করতাম? স্মৃতি এত বিশ্বাসঘাতক কে জানে। কিছুতেই ঠোঁট খুলে একটি কথাও বলল না। অসীম সাহসে ঠাকুরমার সেই ছোট্ট কথাটাকে—'চুরি করা মহাপাপ'—চোখের সামনে তুলে ধরে দুই আঙুলে চটকাতে লাগলাম, যদি এর নিজস্ব কোন চিত্রকল্প ধরা পড়ে। আশ্চর্য হয়ে

দেখলাম, কিছুকাল পরেই ঐ শব্দ ক'টির গা থেকে কাঁচা একটা ধোঁয়ার গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই ভিজে ভিজে কাঁচা ধোঁয়া চারদিকে একটা মিহি পর্দার মত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল! আমি দেখতে পেলাম, একটা লোক অফিসের টেবিলের নিচে তার বাঁ হাত পেতে বসে আছে। আর কোথা থেকে ঝনাৎ ঝনাৎ করে একটা একটা রুপোর বৃষ্টি সেই হাতের উপর এসে পড়ছে। যত পড়ছে, ততই সেই লোকটার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে ভেতর থেকে সাদা বরফের মত অসংখ্য বিন্দু বিন্দু হাসি ঝক্‌মক্ করছে। বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখি, একটা গাড়ি। দুটো যমদূত মাথা নিচু করে পথ ছেড়ে দিল। পাশের কফি হাউসটাতে গিয়ে থামল গাড়িটা। দেখলাম, একটা কালো শামলা-পরা উকীল গাড়ির দরজা খুলে লোকটাকে ভিতরে নিয়ে গেল। কাউণ্টারের উপর বসে ছিলেন জজসাহেব। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে হ্যাণ্ডশেক করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখি, আমার ঠাকুর্দা একটা লাঠিতে ভর করে ডাব্বা হুকো টানতে টানতে সেখান দিয়ে যাচ্ছেন কফি হাউসটার গেটে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন তিনি। সেই ধোঁয়া থেকে তর্‌তর্ করে একটা বউ নেমে এল। মাটিতে পা দিতেই দেখলাম, ঘোমটা খসে পড়েছে। কপালের লাল টকটকে সূর্যটা সর্‌সর্ করে তার বিরাট খোঁপাওয়ালা মাথার সিঁথিতে উঠে সরু একটা রেখা হয়ে গেল। কোথায় বোধহয় একটা কেয়াফুল ছিল—ঝর্‌ঝর্ করে তার গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল বউটির ঘাড়ের উপর। গেটের দারোয়ান তাকে 'নমস্তে বহুজী' বলে সম্বোধন করতেই তার গালে কষে এক চড় কষিয়ে দিল বউটি। তাই দেখে চপের আধখানা মুখে দিতে দিতে থ' বনে গিয়ে একটি লোক বলল, আচ্ছা মেয়েরে বাবা! বউটির মুখে হাসি ফুটলো। এগিয়ে গিয়ে তার চিবুক ধরে নাড়িয়ে দিয়ে বউটি বসে পড়ল সেই অফিসের বাবুটির পাশে। বলল, 'হ্যালো!' দুই হাতে টেনে নিয়ে অফিসের সেই লোকটি তাকে প্রায় কোলের উপর

বসালো। কোথা থেকে আমার সেই ছোটবেলার মাকে দেখলাম—রাস্তার এক কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। হাতে সহজ পাঠ অথবা বাল্যশিক্ষার মত কি একটা যেন। আমাকে লক্ষ্য করে বলছেন - 'আয় খোকা আয়। পড়াটা শেষ করে নে। এই তো লাইন দুটো—'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।' সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, মায়ের পাশ দিয়ে একটা লোক একগাদা বই বগলে নিয়ে পথে থামল। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, কাঁধে চাদর। ফুটপাথ থেকে নিচে পা দিতেই কোথা থেকে হাঁ করে একটা গাড়ি এসে তাকে চাপা দিয়ে চলে গেল। কিন্তু গাড়িটা কিছুদূর এগুতেই একটা পুলিশ হুইসেল বাজিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। গাড়ি থেকে নামল কালো মোষের মত একটা লোক। পুলিশটা তাকে কি যেন সব জেরা করল। পেন্সিলটা উল্টো করে ধরে খচ্‌খচ্‌ খচ্‌খচ্‌ করে কি অনেকটা লিখল। তারপর লোকটির দিকে ডায়েরীটা বাড়িয়ে ধরল। পকেট থেকে একটা স্ট্যাম্প্যাড বের করে, লোকটা তাতে নিজের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে, পুলিশের সেই ডায়েরীতে ছাপ মেরে দিয়ে হাসতে হাসতে গিয়ে গাড়িতে উঠল। মাকে দেখলাম, ছুটে গিয়ে সেই গাড়িচাপা-পড়া লোকটিকে বাল্যশিক্ষার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছেন, আর সেই লোকটি কাৎরাতে কাৎরাতে বলছে একটা 'আনন্দলোকে'র পাতা নিয়ে আসুন, নইলে এ যন্ত্রণা যাবে না। আর আমার হাতের এই যে বড় বড় বইগুলো দেখছেন? কেবলমাত্র বাইরে থেকে আমদানি করা; এই বইগুলো পুড়িয়ে, ধরা-না-পড়া এক দাগী চোরের থুথুর সঙ্গে মিশিয়ে, মলম তৈরী করে সারা গায়ে লেপে দিন। উঃ! না হলে অসহ্য যন্ত্রণা!' আমার ঝুঁকে পড়া মা, মাথাটা সামান্য তুলতেই দেখি, হেলিকপ্টারের মত একটা বড় বাজপাখি তার মাথার উপর বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। আর একটু মাথা তুললেই ঠোক্কর খাবার সম্ভাবনা। আমি চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম—'সাবধান মা।' কিন্তু

চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই সেই প্রথম লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। দেখি, তার ঠোঁট দুটো নড়ছে, এবং তা থেকে শব্দ আসছে—'হ্যাঁ, এইই হল সভ্যতা। গারদের মধ্যে আমারই পাশে বসে থাকা, আমার বিছানা। আশ্চর্য কৌতূহলে নিত্য দিন একেই আমরা'—আবার যেন শব্দের সমস্ত অর্থ আমার চোখের উপর থেকে হারিয়ে গেল। হাঁ করে লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওর অনেক কথারই যেন কোন চিত্রকল্প নেই।

চার

গাছটার নাম কি কে জানে! ফুলের কুঁড়িগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে না ফুলগুলো কি রঙের হতে পারত। অদ্ভুত আশ্চর্য রকমের সব আগুনে পোকা। পোকায় কখনও চিবিয়ে চিবিয়ে ফুলের কুঁড়ি খায়, আগে শুনিওনি, দেখিওনি। গাছের পাতাগুলোর কি হয়েছে কে জানে, কুষ্ঠরুগীর আঙুলের মত মুড়ে আছে। পার্কের দিকে মুখ করা বিরাট একটা বারান্দা। সেই বারান্দায় একটা বড় সেতার, স্টেশনের মাথায় বিজ্ঞাপনের সিগারেটের মত। আঠালো, চটচটে রোদ। নোংরা পেচ্ছাবের মত ঘাম সেই রোদের গা দিয়ে ঝরছে। তারই মধ্যে আশ্চর্য কয়েকটা পাখি। কোথা থেকে এল, কে জানে! ঠোঁট দিয়ে সেতারের তারগুলো নাড়ছে। আশ্চর্য! তবু যদি কোন শব্দ হয়! অথচ ঝুলো বারান্দায় মাকড়সা এসে বড় একটা জাল বুনছে। তার গায় হাওয়া লাগতেই কেমন শব্দ হচ্ছে। কতকগুলো স্বরলিপি যেন ঢেউ খেলতে খেলতে উঠে আসছে সেই জাল থেকে। এমন স্বরলিপি কোন বইয়ে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পার্কের চারধারে অনেকগুলো মানুষের বাচ্চা হাগতে বসেছে যেন। মুখে লেগে আছে কোষ্ঠকাঠিন্য বা অজীর্ণ। ওধারের দোকানে একটা লোক পকেটে হাত দিয়েই ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

বুক পকেট থেকে নোটের বদলে একটা ইঁদুর বাইরে লাফিয়ে পড়ে সকলের চোখের উপর দিয়ে চলে গেল। আশ্চর্য লোকগুলো, সামান্য একটু 'ধর্ ধর্' বলে চেঁচিয়েও যদি উঠল! দোকানদার দেখি বেবিফুডের কৌটোটা আবার কাউন্টারে উঠিয়ে রাখল। আশ্চর্য বেবিফুডের কৌটো, নিচের ফুটো দিয়ে ঝরঝর করে দুধ ঝরছে আর উপর থেকে ভেতরে গিয়ে ঢুকছে তেঁতুল বিচির গুঁড়ো। কাউন্টারের পাশেই একটা রঙিন মেয়েমানুষ! স্পষ্ট দেখা যায়—একটা রবারের বুক থেকে তার ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। বাঁ হাতে বড় একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন। একটা ব্রেসিয়ার কিনে এনে অপরিচিত একটা লোক তাকে দেখাল। তারপরে কোন শব্দ না করে ঠোঁট দুটো নেড়ে কি যেন বলল। তাড়াতাড়ি মেয়েটা ফুটপাথের একটা মোটর গ্যারেজে গিয়ে দাঁড়িয়ে গ্যাস পাইপ থেকে বুকে একটু হাওয়া দিয়ে নিল। বুকটা এত ফুলে উঠল যে, মনে হল, সেই বুক দুটোই তাকে টেনে নিয়ে চলল হন্‌হন্ করে সামনের দিকে। কিছুদূর এগিয়েই, বাঁ ধারের একটা ডাস্টবিনে ছেলেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, লোকটার হাত ধরে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা। ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, একদল ঘেয়ো কুকুরের বাচ্চা ঘেউঘেউ করে উঠে থামিয়ে দিল তাকে। তারপরে সবগুলো বাচ্চাই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে ডাস্টবিনে ঢুকে গেল। সেই মুহূর্তে করপোরেশনের একটা গাড়ি গেল বড় রাস্তা দিয়ে চোঙা ফুঁকতে ফুঁকতে: কুকুরের বাচ্চা ধ্বংস করবার জন্য পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে, করপোরেশন ভবনে এসে খোঁজ নিন। এবং সেইজন্য বাচ্চাদের প্রয়োজনে সরকারী ছাপ মারা দুধের কৌটো কিনুন। এ এক আশ্চর্য পেস্টিসাইড। দুধের গুণে এবং মায়েদের প্রসাদে মানুষের বাচ্চা ডাস্টবিনে বড় হয়। কুকুর ধ্বংসের মানবিক পরিকল্পনার জন্য করপোরেশন অফিসে যোগাযোগ করুন। বিনামূল্যে উপদেশ বিলি করা হয়। তবে এজন্য বাব্‌রি চুল এবং বাঁকানো গোঁপ রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। পুরস্কারস্বরূপ, পরিকল্পনা

রূপায়ণের জন্য যোগ্যতা অনুসারে ধেনো অথবা বিলিতি। সন্ধ্যার আগেই আসুন, না হলে পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত পরিকল্পনা। রেডিওতে, সিনেমার পর্দায়, ট্রাম-বাসের গায়ে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বড় বড় বোর্ডে, এজন্য বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন।' রঙিন অজস্র ইস্তাহার ছড়িয়ে দিচ্ছে লোকগুলো সেই গাড়ি থেকে। বেলবটম-পরা অসংখ্য বাব্‌রি আর জুলপি তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছে।

আমার মনটা তেমন ভাল ছিল না। একটা দুধের কৌটোর দাম আঠারো টাকা। কেনা হয়নি। ছেলেটার শুকনো গলা, ইঁদুরের বাচ্চার মত চিঁচিঁ করছে। বাজারে টাকা নেই, কিন্তু কাগজের নোট আছে। লরি লরি করে সেগুলোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে একদল লোক। ঐ নোটগুলোরই আমার বড় দরকার। হাতে যদিও বেশীক্ষণ রাখা যায় না, ক্যাবারে গার্লদের মত ফর্‌ফর্‌ করে নাগালের বাইরে চলে যায়, তবুও অন্তত সপ্তাহখানেকের জন্য একসঙ্গে ঘর করে। রাইটার্সের শিক্ষা বিভাগের মেঝেতে কোথায় নাকি বড় বড় ফুটো আছে। প্রায়শই ফাইলগুলো সেখান দিয়ে কোথায় গলে যায়। আমাদের কলেজের ফাইলটা এই পঞ্চমবার সেই একই ফুটো দিয়ে কোথায় গলে গেছে। জিজ্ঞাসা করলে জবাব মেলে না। লোকগুলোর যেমন চোখে পলক পড়ে না, তেমনি কানে শোনবার ক্ষমতাও নেই বোধহয়। স্প্রীং-খোলা পুতুলের মত বসে থাকে। হাজারো বার জিজ্ঞেস করলেও ঘাড় নাড়ে না, মুখ নাড়ে না। একটা চাপরাশী শেষপর্যন্ত ইশারা করে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেল। ওধারে একটা ওজন মাপার যন্ত্র। বলল, ওখানে দাঁড়িয়ে ফুটো দিয়ে বড় বড় টাকার নোট ছেড়ে দিলে ওজনের টিকিটের মত ভাগ্যগণনা সহ হারানো ফাইল ফিরে আসে। মিনিমাম চার্জ দশ টাকা। আমাদের কারোরই ওজনের মেশিনে দাঁড়ানো হয়নি, পকেটে টাকা ছিল না। আশ্চর্য সেই মেশিনটা, খোলবার কোন

কলাকৌশল যদি জানা থাকতো! ইঁদুরের বাচ্চার মত ছেলেটার চিঁচিঁ শব্দ বড় কানে বাজছে। ইঁদুরের বাচ্চাগুলো তবু বাঁচে, ভালভাবেই বাঁচে। দাঁত আছে, কেটে আনলেই হল, পয়সা লাগে না। মানুষের বাচ্চাগুলোই বড় অসহায়।

সামনের কাউন্টারে দুধের কৌটোগুলো যতই দেখছিলাম, ততই যেন চোখে জল আসছিল। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছতে গিয়ে দেখি—গঁদের আঠার মত চটচট করছে চোখের কোল দুটো। কুকুরের গায়ের আটালির মত খুঁটে খুঁটে সেই চোখের জলগুলো তুলতে যাব, সামনে হঠাৎ দেখি—সেই প্রথম লোকটা। কেবল স্নান সেরে একটা কালো কোট পরে এসেছে কানের পাশ দিয়ে তখনও দু-এক ফোঁটা জল ঝরছে। তার জলে ধোয়া মুখটা দেখে মনে হল, মোটেও তা নেকড়ের মত নয়, নিরীহ একটা ভদ্র কুকুরের মত। আমার সামনে দাঁড়িয়েই সে বলল, এখনও দেরি করছেন কেন? নিন, তাড়াতাড়ি করুন!

আমি কিছু বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকালাম। সে বলল, কেন করপোরেশন ভবনে যাবেন না?

বললাম, ওখানে গিয়ে কি হবে?

সে বলল, অনেক কিছু হতে পারে। নিন, আর দেরি করবেন না।

কথাটুকু বলেই আমাকে আর ভাববার অবকাশ দিল না লোকটি। জোর করে, হাত ধরে টেনে উঠিয়ে, যেন প্রায় পকেটের মধ্যে পুরে নিয়ে ছুট্ দিল। কোন কিছু ভেবে ওঠবার আগেই এসে থামলাম একটা লাল বাড়ির পাশে। ঝকৃঝকে তকৃতকে। ক' তলা বাড়ি, তা বুঝতে পারলাম না। কারণ উপরের অংশটুকু কুয়াশায় ঢাকা। সামনেই পিতলের প্লেটে বড় বড় করে লেখা—করপোরেশন। ঝক্‌ঝক্ করছে লেখাগুলো। সত্ত তরতাজা, নতুন। দুজন লোক বাড়িটা দেখে নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্তা বলছিল, সামান্য কানে এল—

'বছর ছয়েক হল তৈরী, কেমন নতুন দেখাচ্ছে, বলতো!' কথা কয়টি শুনতে শুনতেই ভেতরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু বাইরের সঙ্গে ভেতরের কী বৈসাদৃশ্য! কলতলার মত স্যাঁতসেঁতে। চারদিক থেকে ঝাঁঝালো পেচ্ছাবের গন্ধ। একটা ভাঙাগাল-বউ দেখি সেই স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকছে। খাটা পায়খানার পোকার মত চারদিকে কিল্‌বিল্‌ করছে গাদা গাদা বাচ্চা। মেয়েটার পেটের ভিতর বোধহয় বড় একটা ডিম, মাঝে মাঝেই নড়ছে। আর তাকে ঘিরে গোঁপওয়ালা একটা হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক করছে। মাথা দিয়ে গুঁতোচ্ছে কেবল। পুকুরে নামাতে চায়।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেই মেয়েটির গাল দুটো ভেঙে গেলেও চোখ দুটো বেশ বড় বড়। বিশাল শ্রাবণের আকাশের মত। কেমন একটা চুম্বক যেন। মনে হল, কেমন মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ। হাড় জিরজিরে দেহের মধ্যেও যেন একটা নরম লেপ আছে। আমার রক্তের মধ্যে কোথায় কতকগুলি অস্থির পোকা ছিল, কিল্‌বিল্‌ করে উঠল। মনে হল, একটা নরম বিছানায় আরাম করে শুতে পারলে যেন শান্তি। সেই মেয়েটির দিকে বোধহয় এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন স্থির সন্ধ্যাতারার মত মেয়ে যে, সেইদিকে তাকালে অনেক কিছুই ভুল হতে চায়।

সেই প্রথম লোকটি হঠাৎ আমার হাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা একটা টান দিল। টানটা এমন, যেন একটা গ্রহের পাশ দিয়ে নক্ষত্র ছুটে যাবার মত। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। লোকটি নিজেই দুই হাতে আগলে ধরে আমাকে বাঁচালো। তার এই অদ্ভুত ব্যবহারের মানে না বুঝে, বড় বড় চোখ করে যেই তার দিকে তাকাতে গেছি, সে বলল—'ওদিকটা কি রকম স্যাঁতসেঁতে দেখতে পাচ্ছেন না? আর একটু এগুলেই পা হড়কে পড়ে যেতেন। অসহ্য দুর্গন্ধ। চলুন, চলুন, উপরে এগিয়ে চলুন।' লোকটা আমাকে প্রায় পকেটে পুরে তর্‌তর্‌ করে উপরে উঠে গেল।

সিঁড়িটা সামান্য একটু শুকনো এখন। দুপাশে আলু-বেগুনের বাজার। শাক-শব্জির গা থেকে পোকা বেরুচ্ছে। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, মেছুড়েরা বসে আছে পিঁড়ি পেতে। পিঁড়ি ভরতি মাছের আঁশ। কোরাসের মত শব্দ উঠছে চারদিক থেকে—'টাট্‌কা মাছের আঁশ, বার টাকা কেজি।' ছোট ছোট থলে হাতে, পিঠ-ছেঁড়া জামা গায় দিয়ে, লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে একদল হাড় জিরজিরে মানুষ। প্রত্যেকেরই কানে ঘড়ি ঝোলানো। কোথায় বাসের প্যাঁ-পোঁ শোনা যাচ্ছে। গন্ধে পেটের ভিতরটা গুলিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, সেই মুহূর্তে আমার সঙ্গের লোকটা একটা সিগারেট ধরানোতে দুর্গন্ধের হাত থেকে বাঁচা গেল। আরও কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেলাম। মুরগির বাচ্চার মত অসংখ্য কিচ্‌কিচ্‌ আওয়াজ ডান পাশে। দেখি, একটা দোকানে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে একটা লোক দাঁড়ি-পাল্লায় ইঁদুরের লাদি আর আরশোলার ঠ্যাং মেপে মেপে কিউ-এ দাঁড়ানো ছেলেগুলোর থলে ভরছে শুধু। কে একজন এরই মধ্যে উঁকি দিয়ে বলে গেল, পাণ্ডুয়ার চিনি আর পাওয়া যাচ্ছে না। মোটা ভুঁড়িওয়ালা একটা লোক কাউন্টারে বসে। সে বলল, 'তাহলে ময়ূরাক্ষীর দিয়ে দাও।' ভিড়ের মধ্যেই দেখলাম, দুজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ সেই ভুঁড়িওয়ালা লোকটার কাছ থেকে অর্ডার নিচ্ছে—'তাহলে এনট্রোকুইনল খুব বেশী দরকার হবে না?' ভুঁড়িওয়ালা লোকটা হাসতে হাসতে বলল, 'ইমিউনিটি গ্রো করে গেছে। এবার সেইজন্য কলেরার ব্যবস্থা। স্যালাইন ওয়াটারটা চলবে বেশী। হ্যাঁ, তা মিহি কাঁকরও তৈরী করতে পারেন।' পেন্সিলের গোড়াটা সামান্য কামড়ে ধরে একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ বলল, 'আর্টিফিসিয়াল স্টোন তৈরী করা না গেলে খরচ বড় বেশী পড়ে যাচ্ছে।' ক্যাশে কি সামান্য একটু দেখে নিল ভুঁড়িওয়ালা লোকটি। তারপর বলল, 'তাহলে দুই ওয়াগন ইঁদুরের লাদি আর আরশোলার ঠ্যাং পাঠিয়ে দেবেন।' হাতের রাইটিং

প্যাডে অর্ডারটা টুকে নিয়ে মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভটি বলল, সেটাই ভাল, নইলে স্যালাইন ওয়াটারে তেমন প্রফিট হবে না।

একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম। আমার সঙ্গের সেই প্রথম লোকটি তা দেখে প্রায় প্রচণ্ড রকমে ধমকে উঠল, দেরি করবেন না, তাহলে পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি। সুতরাং আবার এগুতে লাগলাম।

সিঁড়ির দুই ধারে বড় বড় অসংখ্য দেয়ালঘড়ি, অনবরত টিক্‌টিক্ শব্দ হচ্ছে, টিক্‌টিক্ শব্দের একটা আশ্চর্য মেলা। সেই শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসংখ্য জনস্রোত নামছে নিচের দিকে। বাঁধ ভাঙা সেই প্লাবনের গতি ঠেলে এগুনোই কষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে উপরের তলায় উঠে একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে নিশ্বাস ছেড়ে যেন বাঁচলাম।

একটা মেয়ে দেখি সিনেমার একটা পোস্টারের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। হাতে একটা ঘড়ি, অনেকক্ষণ ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম ঘড়িটা চলে না। মেয়েটা একটু কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রোফাইলটা ভাল। আমাকে দেখে ফিক্ করে একটু হাসলো, তারপরে ঘুরে দাঁড়ালো। একটা পাতলা শাড়ির ফাঁকে ছোট ছোট দুটো সুডৌল বুক দেখলাম। মেয়েটা চোখটা কেমন একটু টিপে দিল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, পাতলা একটা মিষ্টি গন্ধ বেরিয়ে এল আমার দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সঙ্গী সেই প্রথম লোকটি পকেট থেকে বড় একটা চুরুট বের করে ধরাতে লাগল। সেই ফাঁকে মেয়েটির চোখের সেই আশ্চর্য রুমাল দেখে আমি কিছুই যেন আর ভাবতে পারলাম না। সম্মোহিতের মত এগিয়ে গেলাম তার দিকে।

কাছে এগিয়ে যেতেই মেয়েটি দুই হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বগল তলায় একটা কাগজ ছিল, বের করে সেটি দেখাল। দেখলাম একটা সিনেমার কাগজ। রঙিন এক অভিনেত্রীর পাশে একটা ব্রেসিয়ারের বিজ্ঞাপন। তার নিচে গর্ভ-নিরোধক ট্যাবলেটের কথা।

একটা সরকারী বিজ্ঞাপনও আছে : সুখী পরিবার ছোট পরিবার। আরো সুখী পরিবার হল আইনত কোন 'পরিবার' গ্রহণ না করা।

মেয়েটা তার একটা হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরল। হাতখানাকে বাইরে থেকে যত মোলায়েম মনে হয়েছিল, তত মোলায়েম মনে হল না। বুড়ো একটা লাউয়ের ডগার মত। মোটা মোটা শিরা। তাই দিয়ে বেশ ভাল করে জড়িয়ে ধরে সে আমাকে টানতে লাগল। চোখে সত্যি আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ। নাকটা ওর গালের কাছে নিয়ে ভাল করে ওকে দেখতে ইচ্ছে হল। বারান্দার একপাশে এককালি অন্ধকার, সেই দিকে নিয়ে চলল আমাকে সে। আমি ফিস্‌ফিস্ করে তার কানে কানে বললাম, তোমার নাম কি ? মেয়েটি আলতো করে তার রঙিন ঠোঁট দুটো আমার গালে ছুঁইয়ে দিয়ে বলল, মনে নেই, আমার অন্নপ্রাশনের সময় বাবা যখন মহাভারত এবং মা যখন রামায়ণ পড়তেন, তখন কী যেন একটা নাম রেখেছিলেন, তারপর দিনরাত এই যে বড় বড় যজ্ঞ হচ্ছে, তাতে রামায়ণ মহাভারতের সব কয়টি পাতাকেই পোড়ানো হয়েছে। নামটা আমার আর তাই মনে নেই। পুলিশকেও যদি এই সামান্য আয় থেকে ভাগ দিতে হয়, তাহলে নাম কি করে মনে থাকে বলুন তো ? আমি বললাম, তাহলে আমি তোমার একটা নাম দিচ্ছি। ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল মেয়েটি, 'বলুন ! ডিক্সনারী ঘেঁটে ঘেঁটে আর পারা যাচ্ছে না।' আমি বললাম, তোমার নাম মোহিনী। মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ, আর একজন এই ধরনের একটা নাম দিয়েছিল, কামিনী।

আমি মোহিনীর হাতের ঘড়িটা চোখের খুব কাছে টেনে এনে তুলে দেখলাম,—বুড়োদের শিথিল পুরুষাঙ্গের মত অচল। বললাম, তোমার ঘড়িটা চলছে না কেন ? ও হাসতে হাসতে বলল, চলে, বিকেল চারটে থেকে রাত বারোটা অবধি। আমারটা তো তবু চলে। আর ছেলেদের ঘড়িগুলো দেখুন, ঢিবি দিয়ে পড়ে আছে এক

কোণে। একটাও চলে না। দেখলাম, বারান্দার এক কোণে স্তূপীকৃত একগাদা ঘড়ি। মেয়েটি বলল, ওগুলোর মধ্যে দু-একটা চলে, পোর্ট থেকে যখন ওয়াগনগুলো বেরয়, তখন।

আমার শরীরের মধ্যে মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে কেমন যেন অবশ হয়ে আসছিল। মোহিনীকে বললাম, চল ঐখানটায় বসি। মোহিনী বলল, 'সেকি! আমার ঘড়িতে যে এখনও চারটে বাজেনি। চারটের আগে এ ঘড়ি তো কিছুতেই চলবে না।' এই বলে মোহিনী জোনাকির মত তার চোখ দুটোকে দপ্‌দপ্‌ করাতে লাগল। আমার মনে হল, আসলে ও দুটো লাইট হাউস, নির্বিবাদে জাহাজ চালিয়ে দেওয়া যায়। যেই না এই ভেবে তার দিকে এগুতে যাব, হঠাৎ বারান্দার ওধার থেকে আমার সঙ্গী সেই প্রথম লোকটির কণ্ঠ শুনলাম, চিৎকার করে ডাকছে: হ্যালো, মিস্টার তুমি কোথায় গেলে? সেই ডাক শুনে মোহিনী তার বুকের আঁচল খুলে আমাকে ঢেকে দিতে গেল। তার মিহি আঁচলের মিষ্টি গন্ধে আরাম করে চোখ দুটো ভাসাতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ অনেক দূর থেকে ধাঁই করে লোকটার একটা হাত এসে আমার ডান হাতের বাহুতে পড়ল। পাখির নখের মত আঙুল দিয়ে এমনভাবে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল যে, আমার মনে হল, হাতের পেশীতে কে ফাঁস লটকে দিয়েছে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই ব্যাঙের জিবে একটা পোকার মত আমি ছিট্‌কে চলে গেলাম ওদিকে। লোকটি তিরস্কারের ভঙ্গীতে আমাকে বলল, জনমভর তো এখানেই কাটালেন, তবু এখন পর্যন্ত এ পাঠ চুকাতে পারলেন না? নিন্‌ নিন্‌ আর দেরি নয়, তাড়াতাড়ি পা চালান। দেরি হলে শেষ পর্যন্ত আর হয়তো পাওয়াই যাবে না। কিছুমাত্র প্রতিবাদের অবকাশ না দিয়ে, আমাকে লোকটি প্রায় জোর করে পরের ধাপের সিঁড়ির উপর ঠেলে দিল। তারপর পাহাড়ী ট্রেনের একটা ইঞ্জিনের মত আমাকে টেনে নিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

এ-তলাটা অনেক পরিষ্কার। ঝির্‌ঝির্ ঝির্‌ঝির্ করে যেন অদৃশ্য পাউডারের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। জানালা দরজা সব বন্ধ, অথচ চারদিকে আলো। ঘরগুলোর দেয়ালে দেয়ালে নিয়নের জ্যোৎস্না, ভেতরে নীল রাত্রি। টেবিলে টেবিলে প্লাস্টিকের কোমল, এবং সর্বত্র মাখন তোলা হাওয়া। অথচ এত সুন্দর আলোকিত ঘরের পাশে বড় বড় গুদাম, সীল করা। দরজায় বোর্ড ঝোলানো 'সরকার অনুমোদিত নিষিদ্ধ এলাকা।' গুদামের পাশে ছোট ছোট ঘর, তাতে গদি সাজিয়ে বসে আছে ভুঁড়িওয়ালা সব লোক। হাতে ফোন। মুখে হাসি। একটা লোক বড় একটা স্ক্রু দেয়ালে পুঁতে স্ক্রু-ড্রাইভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে ভুঁড়িওয়ালা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে। কাকে যেন সে জিজ্ঞাসা করল, আউর এক পেঁচ দে দেগা? কয়েকজন মোটা লোক পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে যেন কি বলল। তারপর একজন বলল, হাঁ, দে দো। লোকটা স্ক্রু ঘোরাতেই ওধারে ক্রিকেট-মাঠের বোর্ডের মত একটা বড় বোর্ডে কয়েকটি শব্দ ভেসে উঠল—চেম্বার্স অব কমার্স। তারপরই দেখি দলে দলে ইঁদুর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে, আর এই মোটা লোকগুলো আদর করে তাদের কোলে বসাচ্ছে। একটা মোটা লোক পকেটে দুটো ইঁদুর গুঁজে নিয়ে নিজেই উঠে এল স্ক্রুটার কাছে। তারপরে সে নিজে হাতে আর এক প্যাঁচ ঘুরিয়ে দিতেই সেই বোর্ডটাতে দেখি আর একটা নতুন শব্দ ফুটে উঠেছে—'পদ্মভূষণ'। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নিচের তলাগুলোতে অনেকগুলো শব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড হৈচৈ হচ্ছে, কয়েকটা শিশু কাঁদছে এবং দলে দলে অনেকগুলো কণ্ঠে শব্দ হচ্ছে—বোল হরি, হরিবোল।

আমার পাশের লোকটি আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ওপাশে। এখানকার ঘরগুলো আরো বেশী সাজানো। মোটা লোকগুলোর কাছে একদল কোট-প্যান্ট পরা লোক দেখেছিলাম। দেখলাম তারাই সব এইসব ঘরগুলোতে এসে ঢুকছে। প্রত্যেকের

পিঠে বড় বড় লেবেল আঁটা। তাতে কারো লেবেলে লেখা, কেমিস্ট, কারো অ্যাকউনটেন্ট, কারো লেখা মিনিস্ট্রি অব কমার্স, কারো ইনকামট্যাক্স। একটা ঘরে দেখলাম প্রচুর আসবাবপত্র। আলমারিতে আলমারিতে অনেক বইও। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। কোন দিন হাত পড়েছে বলে মনে হয় না। এক আলমারি ভর্তি ভারতীয় দর্শন। সে আলমারিটাতে পাঁচটা তালা আঁটা। অন্য সব বইয়ের আলমারিতেও তালা দেওয়া, তবে তালার সংখ্যা নগণ্য। সম্ভবত টেপা-তালা। একটি আলমারিতেই দেখলাম তালা নেই, ডালা খোলা। আলমারির কপালে লাগানো একটা বড় কাগজের লেবেল, লেখা—সেক্সোলজি।

এতসব থাকা সত্ত্বেও মোমের মত এক মহিলাকে দেখলাম—এক গাদা বেবীফুডের কৌটোর উপর বসে আছে। হাতে একটা পেঙ্গুইন সিরিজের বই। মলাট পড়ে দেখলাম, লেখা আছে—হাউ টু অ্যাপীল সেকস্যুয়ালী এণ্ড এনজয় সেক্স আউটসাইড দি লীগ্যাল পার্টনার। গোলাপ পাপড়ির মত ঠোঁট খুলে মহিলাটি তাকাল আমার দিকে। চোখে তার নীল আকাশ, আর নাকের নিশ্বাসে যেন ফাগুন মাস। চৈত্রের সান্ধ্য হাওয়ার মত তার মোমের শরীরটার উপর মিহি নীলাম্বরী উড়ছে। লুকিয়ে লুকিয়ে শরৎচন্দ্রের বই পড়ছি মণ্ডপঘরের পেছনে, সেই দৃশ্যটা আমার মনে পড়ল। মনে হল, সেই বইয়ের নায়িকারা যেমন করে আমাকে ডাকত, তেমনি করে ডাকছে যেন মহিলাটি। বুকের মধ্যে একটা দুর্বিনীত মুরগির মত আমার কলজেটা আছড়াতে লাগল। এক পা দু পা করে এগিয়ে যেতে লাগলাম সেইদিকে। কত কাল, কত অনন্ত যুগ ধরে এর জন্যেই তো মানুষের সাধনা! আমি পা দুটো জোরে চালিয়ে দিলাম সেই ঘরের দিকে। মাখন তোলা হাওয়ায় বুকের আঁচলটা খসে পড়ল সেই মহিলার। মনে হল, বাঁ পায়ের জঙ্ঘা পর্যন্ত একতাল নরম মাখন দেখা যাচ্ছে, এবং আর একটু যদি এগুতে পারি, তাহলে জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধি।

আমার সঙ্গী সেই লোকটি হাত ধরে টানলো আমাকে, এখানে নয়। এখানে নেই। 'আমি জোর করে হাতটা ছিনিয়ে নিলাম, রাখ, তোমার কোন কথাই আর শুনব না।' ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করে দৌড়ে এগিয়ে গেলাম সেই মহিলার দিকে। এমন মিষ্টি গন্ধ গোলাপের প্রথম শিশিরের মধ্যেও থাকে না। আমি যেন একটা ননীর সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লাম। দুই হাতে জাপটে ধরে দলে মুচড়ে পিষতে যাব তাকে, হঠাৎ বেবীফুডের কৌটোগুলো উল্টে মহিলাটি পড়ে গেল নিচে, আর উল্টে যাওয়া কৌটোগুলোতে চাপা পড়ে থাকা এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে আতঙ্কে প্রবলভাবে চীৎকার করে উঠলাম আমি। দেখলাম, অনেক শিশুর দেহ আলো-বাতাসহীন উদ্ভিদের মত বিবর্ণ হয়ে আছে সেই কৌটোগুলোর নিচে। অধিকাংশেরই চোখ, নাক, কান, গলা সব পচে গেছে। একটা বিশ্রী চিম্‌সে টাটকা মড়ার গন্ধ।

তারপর অনেকক্ষণ আর কোন কথাই আমার মনে নেই। যখন আবার নতুন করে চারদিক দেখতে পেলাম, দেখলাম, অন্য আর একতলায় দাঁড়িয়ে আছি। উর্দিপরা সব চাপরাশী, আর টুপিপরা সব পুলিশ। অনেক ঘর, ঝকঝক করছে ঘরের দরজায় নেমপ্লেট। সর্বত্রই বড় বড় সুদৃশ্য বোর্ডে চমৎকার হাতের লেখা : জন-সাধারণের সেবার জন্য।' কিন্তু লোক নেই। যা দু-চারজন লোক ঘোরাফেরা করছে, তাদের অধিকাংশের মুখই হায়েনার মত। পার্কে দেখা সেই দ্বিতীয় লোকটাকেও দেখলাম। সেই নেকড়ের মত লোমশ মুখ, আমার পাশের প্রথম লোকটিকে দেখতে পেয়েই ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে উঠে বলল, আরে আপনি এখানে ?

প্রথম লোকটি বলল, সেই সেখানে যাচ্ছি। আশ্চর্য! সেই দ্বিতীয় লোকটা একবার জিজ্ঞাসাও করল না যে, কোথায় ? অথচ আমি নিজেই জানি না কোথায়! প্রথম লোকটি দ্বিতীয় লোকটিকে বলল, এখন কি হচ্ছে ? দ্বিতীয় লোকটি সিগারেটের প্যাকেট থেকে

একটা মসলা মাখানো মুরগির ঠ্যাং বের করে চিবুতে চিবুতে বলল, অপারেশনের পরিকল্পনা।

আমার মনে হল রাইটার্সের সেই কেরানীটার মুখ দেখলাম শিক্ষামন্ত্রীর দরজার ফাঁকে। আমাকে দেখেই বোধহয় চট করে আড়াল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, এই পঞ্চম-বারও ইউ. জি. সির ফাইলটা ওর টেবিল থেকে উধাও হয়ে গেছে, এবং সেই সঙ্গে চোখে ভেসে উঠল দুদিন মিছরির জল খাওয়া আমার ছেলেটার মুখ। মাথাটা গরম হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে দুদিক থেকে দুটো গ্রে-হাউণ্ডের মত পুলিশ রাইফেল আড়াআড়ি করে ধমকে উঠল যেন. খামস! কাঁহা যাওগে? বললাম, দেখা করব।

—কিসিকা সাথ?

—মিনিস্টর কো।

—নেই হোগা।

—কাহে?

—উ লোক সবকো সাথ ভেট নেই করতা।

—কিন্তু ঐ যে লেখা রয়েছে জনসাধারণের জন্য?

হঠাৎ একটা ভয়ানক বিষম খেল সেই দ্বিতীয় লোকটি। মুখটা লাল হয়ে উঠল। তারপর নিজের হাতের তালু দিয়ে মাথার চাঁদিতে খানিকটা থাবড়ে নিয়ে ধাতস্থ হবার পর খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল।

আমি বললাম, হাসছেন কেন আপনি?

সে বলল, দেখছেন না, লেখা আছে জনসাধারণের জন্য?

বললাম, সেইজন্যেই তো যাচ্ছি, আমি জনসাধারণের একজন।

লোকটি পিটপিট করে হাসতে হাসতে বলল, আপনি 'জন' বটে। কিন্তু সাধারণ কি?

বললাম, কিছুটা হয়তো ব্যতিক্রম। আমি একজন অধ্যাপক কিনা, হয়তো একটু অসাধারণ!

লোকটা আমার কথা শুনে তাজ্জব বনে আস্ত একটা সিগারেটই চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। তারপর হোহো করে হাসতে লাগল। বললাম, হাসছেন কেন ?

লোকটা একটা বোতাম টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। তখন সে বলল, ভেতরে গিয়ে দেখুন।

ভাবলাম, আমার পরিচয় পাবার পর ওর মনে সমীহের ভাব দেখা দিয়েছে। ভেতরে ঢুকে গেলাম। ঢুকে দেখি ঘরে অফিসের মত কোন টেবিল চেয়ার নেই। রিসিভ করার কোনও লোকও নেই। সামনে একটা বড় কালো বোর্ড, তাতে শ্রেণী হিসেবে মানুষের তালিকা টাঙানো। তালিকাটা এই ধরনের :

প্রথম শ্রেণী :	ছদ্মবেশে খুনী এবং ডাকাত। এই শ্রেণীতে বড় বড় জোতদার এবং মিল মালিকদের এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরও ধরা যাইতে পারে।
দ্বিতীয় শ্রেণী	চোর, ঘুষখোর, কণ্ট্রাকটর, ক্যাবারে গার্ল।
তৃতীয় শ্রেণী	চাটুকার, তোষামুদে, এবং সুন্দরী মেয়ে সরবরাহকারী। এই শ্রেণীতে মদের দোকানের মালিকদেরও ধরা যাইতে পারে।
চতুর্থ শ্রেণী :	সরকারী অফিসের সৎ কর্মচারী এবং নিত্য অভাবেভোগা ভদ্রলোক।
পঞ্চম শ্রেণী	নিরাপদ সওদাগরী অফিসের কেরানী।

ষষ্ঠ শ্রেণী :	কুটীরশিল্পী, অল্প জমির মালিক এবং মজুর।
সপ্তম শ্রেণী :	সম্পদহীন ভবঘুরের দল।

আর কোন লিস্ট নেই। তবে চার্টের শেষে স্টার মার্ক দেওয়া ফুটনোট আছে। খুব ছোট ছোট অক্ষরে লেখা, বর্জাইস টাইপের মতো। কাছে এগিয়ে গিয়ে কষ্ট করে পড়লাম। লেখা আছে, 'এক শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানী জনগণকে আরো এক শ্রেণীতে ভাগ করিতে ইচ্ছুক। এই শ্রেণীতে প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী এবং কলেজের শিক্ষকদের ধরা যাইতে পারে। তবে ইহার জন্য সংবিধানের পরিবর্তন আবশ্যক। সংবিধানে মৌলিক নাগরিকদের পর্যায়ে ইহারা পড়েন না। কেহ কেহ ইহাদের সপক্ষে আন্দোলন করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু ইহা কতদূর কার্যকর হইবে তাহা লইয়া সন্দেহ আছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহাদের অস্তিত্ব লোপ করিবার কথাও কেহ কেহ চিন্তা করিতেছেন।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেটে নিজের নাম-না-দেখা পরীক্ষার ফল প্রত্যাশী ছাত্রের মত মনটা বড় ভেঙে গেল। কখন এক মহিলাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন পাশে, দেখতে ভারি সুন্দর। ফুলদানির জলে বসিয়ে রাখা ফুলের মত। তীব্র গন্ধ না হলেও ভেজা ভেজা একটা গন্ধ আসছিল তার গা থেকে। একবার, দুবার, তিনবার চশমা পাল্টে লিস্টটা দেখলেন তিনি। তারপর যেন তার মুখ থেকে একটা পাপড়ি খসে গেল। আমার বুকের উপরই ঢলে পড়লেন তিনি। ঢলে পড়বার ঢঙটা ভারি সুন্দর। তার পাপড়ির মধ্য দিয়ে অনেক গভীরে হাতটা ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছে হল আমার। হঠাৎ এমন সময় লাল আলো জ্বলে উঠলো দেয়ালে : ফাইভ মিনিট্স মোর। সেই লাল আলো দেখে ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করে বললেন, আপনি কোন শ্রেণী? বললাম, বুঝতে পারছি না।

ভদ্রমহিলা বললেন, প্রথম শ্রেণীর খাঁটি লোক কে বলুন তো?
বললাম, বাইরে সুন্দর ঘরগুলোতে যারা বসে আছে সম্ভবত তারাই। কথা বলতে বলতে আমরা বাইরে চলে এলাম।

তখনও ভদ্রমহিলা আমার হাত জড়িয়ে ছিলেন। এবং সেইজন্য ছোটবেলায় প্রথম মেয়েকে দেখে নিজের বুকের মধ্যে যে-রকম একটা গন্ধ পেয়েছিলাম আমি, সেইরকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম। ফুলদানিতে ফুলের পাপড়ির মত তার শরীরটা অনেক শীতল বটে, এবং বাহু-মূলে কিছুটা মাংস থলথলে হয়ে ঝুলে পড়েছে, তবু বেশ ভাল লাগছিল। সংসারের নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ এইসব পবিত্র ব্যবহৃত দেহের প্রতি চিরকালই আমার একটু দুর্বলতা আছে স্বীকার করছি। সেইজন্য নিম্নাঙ্গ থেকে উঠে আসা কতকগুলো শিরার মধ্যে আমি একটা আনন্দ-হিল্লোল অনুভব করছিলাম। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই প্রথম লোকটি বলল, বড্ড দেরি করে ফেললেন। এরকম হলে, আমরা কিন্তু শেষপর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুতে পারব না, চলুন, আর দেরি করবেন না।

মহিলাটি তখনও আমার হাত ছাড়েন নি। বললেন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। প্রথম লোকটি তার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু আপনি পারবেন না, আমাদের অনেক তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।

দ্বিতীয় লোকটির মুখ দিয়ে দেখলাম লালা গড়িয়ে পড়ছে। জিব দিয়ে মাঝে মাঝেই সেই লালাটা চেটে নিচ্ছে সে। পকেটে কোথায় একটা কাজলের কৌটো ছিল, এক ফাঁকে সেটা বের করে দুই চোখে সামান্য মেখে নিল। তারপর বার বার চোখের মণি দুটি সেই মহিলার দিকে ঘোরাতে লাগল।

প্রথম লোকটি আমার হাত ধরে জোরে একটা টান দিল, চলুন। ভদ্রমহিলা আমাকে ছাড়বেন না, আসবেনই। তার পুরনো বালিশের মত বুক দুটো আমার বুকের সঙ্গে লেপ্টে আছে। শরতের সকালের মত ঠাণ্ডা বুক। মনে হচ্ছিল জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে চলি। কিন্তু

আমি তাকে টেনে ধরবার আগেই হ্যাঁচকা এক টানে অনেক দূর সরিয়ে নিয়ে গেল দ্বিতীয় লোকটি। মহিলাটি চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটি তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ছুটতে লাগল—পাশের একটা ঘরের দিকে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, পেছনে দৌড়ে গিয়ে আটকাই ওকে। কিন্তু আবার সেই পাখির আঙুলের ফাঁস লটকে দিয়েছে প্রথম লোকটি আমার বাহুতে। এমন কঠিন ফাঁস যে, সমস্ত শরীরেই যেন কোন শক্তি নেই। কাঁচপোকায় হুল ফোটানো একটা আরশোলার মত আমি সম্মোহিতের মত তার পেছনে পেছনে এগিয়ে চললাম।

নতুন যে তলায় এসে উপস্থিত হলাম, তাতে তেমন আলো নেই। চারদিকে কাঁচা আমের মত কতকগুলো বাল্‌ব। জলের নিচে ডুব দিয়ে তাকিয়ে থাকলে যে-রকম দেখা যায়, সেইরকম অনেকটা। শুধু একটা সবুজ সবুজ আলো দেখা যায়, অন্য কিছুই চোখে পড়ে না। ছোটবেলায় মায়ের পাশে শুয়ে শুয়ে রামায়ণ পড়বার সময় এইরকম একটা ছবি দেখেছিলাম কিনা কৃত্তিবাসের রামায়ণে, সেই কথাটা ভাববার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই সে চিত্রটা মনে পড়ল না। শুধু যেন মনে পড়তে লাগল, যে-মাটিতে এতকাল হেঁটে এসেছি, এ-আলোটা যেন সেইরকম স্যাঁতসেঁতে।

কিছুই দেখা যাচ্ছে না, অথচ এখানে যে অনেক মানুষ চলাফেরা করছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ, চারদিকে চাপা ফিস্‌ফিস্ শব্দ। কারা যেন অতি সন্তর্পণে চুপি চুপি কথা বলছে। অথচ কথাগুলো কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

যখন বিভ্রান্ত বোধ করছি, সেই সময় বুঝলাম, আমার সঙ্গের সেই লোকটি আমাকে আর ধরে নেই। আমি সামান্য ভয় পেয়ে বললাম, তুমি কোথায়? কোন জবাব এল না। কোন্ দিকে, কিভাবে অগ্রসর হব ভেবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে যাচ্ছি—হঠাৎ বাঁ গালে মাখনের মত নরম ছুটো কি এসে পড়ল যেন, এবং গালে পড়েই সে

দুটো পাখাওয়ালা পিঁপড়ের মত তুর্‌তুর্‌ করতে লাগলো। হাত দিয়ে বুঝলাম, একটা মাথা। মাথা ভরতি রেশমী চুল। তুলোর মত মুখ। খুব ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, কালো ম্যাক্সি গগলস্‌ পরা একটি মেয়ে। রঙিন ঠোঁট দুটো আশ্চর্য সুন্দর। মোম দিয়ে তৈরি সমস্ত শরীরটাতে সাঁতারের পোশাক আঁটা। আশ্চর্য বুক দুটো যেন ছাঁচে ঢালা। সেই বুক দুটো দিয়ে সে আমাকে জাপটে ধরল। আমার রক্তের মধ্যে দুধের কড়াই বসে গেল যেন। বুঝলাম, উছ্‌লে উঠছে রক্তগুলো। একটা গরম ঝির্‌ঝির্‌ সর্বাঙ্গে, ফুলশয্যার রাতে প্রথম দিন আইনত অধিকার নিয়ে আমার স্ত্রীর হলুদ ঠ্যাং কামড়ে ধরবার মত ; এবং তারপর হাঁসের মত ঠোঁট দিয়ে পুকুরে ডুবে গুগলি ভেঙে ঘিলু খাবার মত। ও ধরনের চলচ্চিত্রের মত বুক আমি আর কখনো কোন দিন অনুভব করিনি। মনে হল, আবার সেই হাঁসের মত ঠোঁট খুলে ওর পাঁকের মত নরম শরীরটাতে কুর্‌কুর্‌ করে সেই বড় ঝিনুকটাকে খুঁজি। আমার শরীরে জোয়ার আসবার পর থেকেই সেই ঝিনুকের প্রতি আমার দারুণ লোভ। বস্তুত সব মানুষেরই সেটা থাকে। ঝিনুক খাবার জন্যই তো জন্ম। হাঁসের স্বভাবই তো ঝিনুক বা গুগলি খাওয়া। আমার শরীরের ভিতর সেই হাঁসটা আমাকেই কুর্‌কুর্‌ করে ঠোকরাতে লাগল যেন। সন্ধ্যাবেলার শেয়ালের মত আমার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল। মনুসংহিতার চাপে অনেকদিন আমি এইভাবে শেয়ালের মত চেঁচিয়ে উঠিনি। সুযোগ পেলে আমার মাঝখান থেকেই এমন শেয়াল বেরিয়ে আসে কিনা কে জানে। এক একটা দুনিয়া বোধহয় এইভাবে শেয়ালের জন্য তৈরী হয়, এবং সেখানে শেয়ালেরা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করে। নাভির গোড়া থেকে একটা একটা প্রচণ্ড সুড়সুড়ি গলা অবধি উঠে আসছিল আমার। সেই গোলগাল মুখখানার দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি কে ?

সে আর একবার তার ননীর মত ঠোঁট দুটো ছুঁড়ে দিল আমার

দিকে। তারপর বলল, আহা! দুষ্টু কোথাকার, তুমি জান না বোধহয়? এইমাত্র আমাকে ডাকছিলে না?

আমার সমস্ত শরীরটাতে তখন গরম দুধের ঢেউ উঠছে। ছোট্ট এই দেহের কড়াইয়ের মধ্যে রক্তের দুধ কাঁপছে। তবুও সামান্য কিছু জ্ঞান ছিল তখনও। বললাম, না, আমার সঙ্গে···মেয়েটি বলল, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমারই তো যাবার কথা ছিল। বলেছিলে না, হ্রদের জলে স্নান করবে? সেইজন্যে দেখ সুইমিং কস্টিউম পরেছি। তুমি যখন হ্রদে নামবে, আমি এটাও খুলে ফেলব।

আমার আর কিছুই মনে থাকল না। আমার মাথার মধ্যে শুধু রক্তের দুধ উছ্‌লে উঠতে লাগল। প্যাঁকপ্যাঁক করে বললাম, হ্যাঁ, আমি হ্রদের জলে ডুবে পক্‌পক্ করে শামুক খাব, গুগলি খাব, চল, চল, আর দেরি করব না।

মেয়েটি আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। আমার হাতের আঙুল-গুলো লেমিংসের মত তুর্‌তুর্ করে হাঁটতে লাগলো ওর দেহের উপর দিয়ে। পাহাড়ের চুড়ো দুটো টের পেলাম। এখান থেকেই লেমিংসগুলো হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তৈরী হল। নীল আলোর জলে আশ্চর্যভাবে সাঁতরে চলেছি আমি। লেমিংসগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে, হঠাৎ মেয়েটি বলল, একটু দাঁড়াও। আমি একটু জোরে জোরেই প্যাঁকপ্যাঁক করে উঠতে যাচ্ছিলাম। মেয়েটি আমার ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে বলল, চুপ! এখানে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলতে হয়।

আমি বললাম, আমার কড়াইয়ের দুধ যে পড়ে যাচ্ছে? সে বলল, দাঁড়াও, এই ঘরে আমার সুইমিং কস্টিউমটা ছেড়ে আসি, এটা থাকলে চলবে না। একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সে। তারপর স্প্রীংয়ের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। তখন একটা অ্যাকসি-লিটারের মত শরীরটা কাঁপছে আমার। অপেক্ষা করতে পারছি না। অধৈর্য হয়ে কয়েকবার পায়চারি করলাম। কিন্তু তবুও মেয়েটা

বেরুচ্ছে না দেখে ঘরটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। কিছুই ভাল করে তাকিয়ে দেখা যায় না। কিন্তু ঘরের দরজায় বড় একটা পিতলের প্লেট ঝক্‌ঝক্‌ করছে। সেটা স্পষ্ট দেখা যায়। দেখলাম, বড় বড় অক্ষরে লেখা 'স্বাগতম'। তার পাশেই লেখা 'ষড়যন্ত্র'। তার নিচেই লেখা 'ইম্পর্টেন্ট ভিজিটরস'। তারপরে বড় একটা নামের লিস্ট টাঙানো। প্রথম দুটো নাম স্পষ্ট পড়া যায়, মনু এবং পরাশর; তারপরও অনেক নাম। কিন্তু কেমন মুছে মুছে গেছে, অর্থ উদ্ধার করা যায় না। তবে শেষের নামটি পড়া যায়, সাণ্ডিল্য চ্যাটার্জী, সরকারী অফিসে শিক্ষা দপ্তরের ইউ. জি. সি সেকশনের কেরানী। তারপরে লেখা 'ঘরে ঢুকিতে হইলে নাম খোদাই করিয়া আসুন। অন্যথায় বে-আইনী প্রবেশকারী বলিয়া গণ্য হইবেন।'

রক্তের মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ করছিল, আর যেন তর সইছিল না আমার। হার্ড মেটাল যন্ত্র দিয়ে ঠুকে ঠুকে না দিলে কোন অক্ষর উৎকীর্ণ করা যাবে না এখানে। মেঝেটা ভাল করে দেখা যায় না। হাতড়ে দেখতে লাগলাম কোন হাতুড়ি বাটালী পাওয়া যায় কিনা। সামনে কিছুই পাওয়া গেল না। পেছনে খুঁজতেই একটা হাতুড়ি আর বাটালী যেন হাতে ঠেকল। বাটালীটা প্লেটের উপর রেখে হাতুড়ি ঠুকতে যাব, হঠাৎ বাটালীর গায়ে দেখলাম লেখা আছে —'সততা'। হাতুড়ির গায়েও লেখা দেখলাম 'সমাজ'। এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না। জোরে জোরে ঠুকতে লাগলাম। কিন্তু এত কঠিন মেটাল জীবনে আমি কখনও দেখিনি। একটুও যদি দাগ কাটতে পারলাম! কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল, কিন্তু প্লেটের গায়ে একটাও রেখা তৈরী করতে পারলাম না। বুঝলাম—বাটালী ভোঁতা হয়ে গেছে। আর কাজ হবে না। রাগে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। দূরে মেঝের উপর 'ঠকর' করে একটা শব্দ করে সেটা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম অসংখ্য কৌতূহলী চোখ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আমার

পেছনে। আর একটা বাটালীর জন্য মেঝে হাতড়াতে লাগলাম। অবশেষে পেছন দিকেই পাওয়া গেল আর একটা বাটালী। তাড়াতাড়ি প্লেটের উপর সেই বাটালী বসিয়ে পাগলের মত ঘা মারতে লাগলাম। কিন্তু এ বাটালীটাও দেখতে দেখতে ভোঁতা হয়ে গেল—তবুও সেই প্লেটের গায়ে এতটুকু রেখাপাত করা গেল না। বিরক্ত হয়ে এটাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছি হঠাৎ বাটালীটার গায়ে দেখলাম খোদাই করা রয়েছে একটি শব্দ। পড়ে দেখলাম লেখা আছে 'নীতি।' কিন্তু অবান্তর নামে আমার প্রয়োজন নেই, আমার ঘরে ঢোকা নিয়ে কথা। আবার পাগলের মত আর একটা বাটালী খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু সেই ফাঁকে হাতুড়িটা কোথায় পড়ে গেল—সেটাকেও আর খুঁজে পেলাম না। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হয়ে অন্ধের মত শুধু চারদিকে হাতড়াতে লাগলাম। অবশেষে হারিয়ে যাওয়া টাকার মত যেন আর একটা হাতুড়ি এবং বাটালী হাতে ঠেকল। দুটোর উপরই কতকগুলো উজ্জ্বল অক্ষরের ছাপ মারা। পড়ে দেখলাম বাটালীর গায়ে লেখা—'দুর্নীতি', আর হাতুড়ির গায়ে লেখা 'অবক্ষয়ী সমাজ'। এবারের বাটালীর গায়ে সামান্য একটু হাতুড়ির আঘাত পড়তেই দেখলাম রেখা পড়ে গেছে। কিন্তু আমার নামের আদ্যাক্ষর খোদাই করবার আগেই ঐ ঘরের ভিতর থেকে একটা অদ্ভুত কণ্ঠ শুনে আমি চমকে উঠলাম, বাবা, তোমার ইউ. জি. সির ফাইল পাওয়া গেল কি? আমার যে বড় খিদে পেয়েছে! আমার বুকের ভিতরটা গুলিয়ে উঠল, একি! এ যে আমার ছেলের কণ্ঠস্বর! কিন্তু আমার সেই ছেলের করুণ কান্নাকে ছাপিয়ে দিয়ে একটা মেয়েলি কলকণ্ঠ শুনলাম ভেতরে। সব কিছুই আমার ভুল হয়ে গেল, মাথার ভেতর একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বলে উঠল যেন। হাতুড়ি বাটালী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুই হাতে দরজা ধাক্কাতে লাগলাম। কিন্তু এমন লৌহকবাট যে, সামান্য নাড়াতে পর্যন্ত পারলাম না।

পাগলের মত চারদিকে খোঁজ করতে লাগলাম, যদি কোন হাতিয়ার-টাতিয়ার পাওয়া যায়। হঠাৎ চোখে পড়ল, আমার পিঠের কাছে দাঁড়ানো লোকগুলোর পেছনে বিরাট একটা হাতুড়ি। সেইদিকে ছুটে গেলাম আমি। লোকগুলো আমাকে দেখে দুভাগ হয়ে সরে গেল। এতবড় হাতুড়ি জীবনে আমি কখনও দেখিনি, তার গায়ে লেখা—'বিদ্রোহ'। সেই হাতুড়িটা নিয়ে দরজাতে ঘা মারতেই দরজাটা বোতাম টেপার মত খুলে গেল। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করলাম, আমার ছেলে কোথায় কাঁদছে। কিন্তু কোথাও আমার ছেলেকে পেলাম না। ঘরের এক কোণে দেখলাম কতকগুলো সরকারী অফিসের ফাইল। তার উপর সুইমিং কস্টিউম পরে বসে আছে একটি লোক। এ-পাশে সেই মেয়েটি। সে বসে আছে কতকগুলো বেবীফুডের কৌটোর উপর। ফাইলের উপর থেকে বসে বসে সেই লোকটি মেয়েটির সুডৌল দুটো বুকের কালো বিন্দু চুষ্‌ছে। তার বাঁ হাতে মেয়েটির ব্রেসিয়ার। লোকটির মুখের দিকে তাকাতেই আমার মাথার রক্তে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেল। কড় কড় কড়াৎ, বাজ ডাকলো। শোঁশোঁ করে হাওয়া বইল। সেই লোকটি আর কেউ নয় সরকারী অফিসে আমাদের সেই ইউ. জি. সি সেকশনের কেরানী— যে এই পঞ্চমবার আমাদের ফাইল লোপাট করে দিয়েছে। আর কিছু ভাবতে পারলাম না, সেই বিরাট হাতুড়িটা তার মাথায় বসিয়ে দিলাম। ফাইলগুলির উপর চিঁড়ের মত চ্যাপ্টা হয়ে গেল লোকটি। আর তার শরীর থেকে নিংড়ে বেরুল এক গাদা কালো আল্‌কাতরা।

মেয়েটি মুহূর্তের মধ্যে বেবীফুডের কৌটো থেকে লাফিয়ে উঠে দুই হাতে আমার গলা ধরে ঝুলে পড়ল—ডার্লিং। আমি তাকে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাঁ পা দিয়ে গলা চেপে ধরলাম, আমার ছেলে কোথায়?

মেয়েটি কোঁকোঁ, কোঁকোঁ করতে লাগল। কোন কথা বলতে পারল না। আরো জোরে তার গলা চেপে ধরতে যাচ্ছি হঠাৎ

পেছনে কার একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি ব্যাটন হাতে একজন সার্জেন্ট। টুপির নিচে চোখ দুটো সিগারেটের মুখের মত জ্বলছে। কোথা থেকে, কখন, কিভাবে এল, কে জানে। আমাকে কোন কথা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করে হিড়হিড় করে উপরের তলার দিকে টেনে নিয়ে চলল। লক্ষ্য করে দেখি, পেছনে যে এতক্ষণ নিস্তব্ধ চোখগুলো আমায় তাকিয়ে দেখছিল— ওরা সবাই পুলিশ। হাতে রাইফেল। সকলে মিলে গুঁতোতে গুঁতোতে আমাকে নিয়ে উপরে তুলল।

উপরের তলাতে না আলো, না অন্ধকার। মাছির মতন সব লোক। নড়েও না, চড়েও না। তাদের চোখগুলো ভয়ানক, শুধু সন্ধ্যা তারার মত জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বলছে। একটা ঘরের ভেতর নিয়ে ঢোকালো আমাকে পুলিশগুলো। তাকিয়ে দেখি, একটা এজলাস। টেবিলের উপর একজন বিচারক বসে। পেঁচার মত চোখ, মুখ গম্ভীর। টেবিলের নিচে বসে পেশকার, এ-পাশের বেঞ্চে কালো কালো কোট পরা সব উকীল। শামলা গায়ে চড়িয়ে আমার সঙ্গের সেই প্রথম লোকটিও উপস্থিত। সে নিঃশব্দ পায়ে আমার কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আমি আপনার প্লীডার। ভয় পাবেন না, নির্ভয়ে কথা বলবেন। এমন বহু কেস আমি জীবনে লড়েছি।' পুলিশ আমাকে নিয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় উঠালো।

বিচারক আমার দিকে তাকালেন, চোখের আলো অনুজ্জ্বল। মনে হল ব্যাটারীতে ড্যাম্প ধরা। সেই অনুজ্জ্বল আলোতে আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখলেন, ইতিমধ্যে একজন পুলিশ অফিসার কয়েক দিস্তা কাগজে টাইপ করা কি একটা বিচারকের টেবিলে রাখল। বুঝলাম আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু এত দ্রুত এতগুলো পাতা কি করে টাইপ করল ওরা? বোধহয় এরকম টাইপ করা কাগজ পুলিশের সেরেস্তাতে সব সময়ই জমা থাকে। শুধু নামধাম একটু পাল্টে দিলেই হল।

বিচারক ফড়ফড় ফড়ফড় করে পাতাগুলো উল্টে গেলেন। যেন একটা হাঁস জল থেকে ফড়ফড় ফড়ফড় করে দুধ তুলে নিল। এমনি করেই সমস্ত অভিযোগ-পত্র পড়েন বিচারকেরা। পড়া শেষ করে আর একবার তাকালেন বিচারক আমার দিকে। নাকটা ঠিক প্যাঁচার ঠোঁটের মত মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল তাঁর। পেশকার এই সময় দাঁড়িয়ে উঠে বিচারকের কানে কি বলল যেন, বিচারক একটু ঘাড় নাড়লেন। তারপর পেশকার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কোন উকীল আছে?

আমি আমার সঙ্গী সেই প্রথম লোকটির দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে বিচারককে বলল, মিঃ লর্ড, আমিই ওর হয়ে সওয়াল করব।

বিচারক আমার দিকে তাকালেন, আপনার কোন সাক্ষী আছে?

আমি বললাম, না।

—তাহলে আপনাকেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হবে?

আমি চুপ করে থাকলাম।

পেশকার উঠে বলল, আপনার কোন্ ধর্ম?

সবটাই যেন কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে মাথার মধ্যে। অনেক চিন্তা করেও মনে করতে পারলাম না কোন্ ধর্ম।

পেশকার অধৈর্য হয়ে বলল, বলুন?

আমি বললাম, জানি না।

বিচারক ঘাড় বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে, সেকি কথা! তাজ্জব ব্যাপার! সমস্ত বিচার কক্ষে একটা গুঞ্জরণ উঠল।

বিচারক বললেন, আপনি কখনও মন্দিরে যান?

—না।

—মূর্তি পূজা করেন?

—করতাম, এখন করি না।

—যাগযজ্ঞ করেন?

—না।

—গীতা পড়েন ?

—আগে পড়তাম, এখন সময় নষ্ট করি না।

—উপনিষৎ পড়েছেন ?

—পড়েছি, মনে হয় ভুল লজিকের ফুলঝুরি।

বিচারক দেখি পাশে কার দিকে ঝুঁকে পড়ে গোপনে একটু সলা-পরামর্শ করলেন। দু-একটা কথা আমার কানে এল, তাহলে হিন্দু বলা চলে ? যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি কোন জবাব দিতে পারলেন না।

বিচারক আবার আমার দিকে তাকালেন: আপনি এখন কোন বই-টই পড়েন ?

—না।

—আগে পড়তেন ?

—হ্যাঁ।

—কি বই পড়তেন ?

—প্রথম গোলে বকোয়ালী, তারপর আরব্য উপন্যাস, তারপর আলালের ঘরের দুলাল, তারপর বঙ্কিম রচনা, তারপর রবীন্দ্রনাথ, তারপর শরৎ, তারপর মানিক, তারপর বিভূতি ও তারাশঙ্কর, তারপর সেক্সের উপন্যাস, এখন কিছুই না।

—এখন পড়েন না কেন ?

—পড়ি না সবগুলো অসার বলে।

—কিরকম ?

—দেখুন, বঙ্কিম কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীকে আত্মহত্যা এবং হত্যা করালেন। তাদের অপরাধ—তারা আড়ালে না থেকে প্রকাশ্যে এসেছিলেন। কিন্তু আড়ালে যারা থেকে গেলেন তাদের গায়ে তিনি আঁচড়টি কাটলেন না। শরৎচন্দ্র মেসের ঝিকে 'সাবিত্রী' বানিয়ে দিলেন। কিন্তু তার মনের মধ্যে ঢুকে দেখলেন না। রবীন্দ্রনাথ

কিছু না পেয়েই তার গুণগান করে গেলেন। একটু-আধটু শ্রদ্ধা করতাম প্রথম প্রথম, যখন জীবনকে ভালবাসতেন। জীবনের সঙ্গে যখন জীবনাতীতকে জুড়ে দিলেন তখনই পা হড়কে পড়ে গেলাম। মানিক সত্য কথা বলতেন বলে বেশি দিন হজম করতে পারলাম না। তারাশঙ্করের যেখানে চেঁচানো উচিত ছিল সেখানে চেঁচান নি। সেক্স উপন্যাস পড়তে গিয়ে দেখলাম সেখানে যত সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী সুড়সুড়ি আমি নিজের মনেই তৈরী করতে পারি। সুতরাং···

—আপনি সুকান্ত পড়েন ?

—প্রথম যখন চাকুরীতে ঢুকি কে একজন পড়তে দিয়েছিল—ছাড়পত্র। তখন নিত্য নতুন নরম হাতের পত্র পড়ে এবং ছিঁড়ে কুল পাই না, পড়ব কখন ? আপনার কাছে আছে ?

—না, নেই। থাক সুকান্ত, আপনি আধুনিক কবিতা পড়েন ?

—এখানে এসে মনে হচ্ছে, পড়লে এতটা অসহায় হয়ে পড়তাম না।

বিচারক মাথা চুলকে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বিবাহ করেছেন ?

—না।

—তবে ?

—যাকে ভাল লেগেছিল তাকে নিয়ে ঘর করি।

বিচারক আবার মাথা চুলকাতে লাকলেন, তারপর আপন মনেই বিড়বিড় করে বললেন, তাহলে ঠিক হিন্দু বলা যায় না। টেবিলের উপর একটা পেন্সিল পড়ে ছিল, সেটা তুলে নিয়ে উল্টোদিকটা খানিকক্ষণ তিনি কামড়ালেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কখনও গির্জেয় গিয়েছেন ?

—না।

– বাইবেল পড়েছেন ?

—হ্যাঁ, তবে বাইবেলকে ভয়ানক ঘেন্না করি।

—কেন?

—কয়েকটা কথার জন্য।

—কি কথা?

—'এক গালে থাপড় খেলে আর এক গাল পেতে দেবে' এই কথার জন্য। কারণ এই কথা অনুযায়ী চলতে গিয়ে খ্রীষ্টাব্দের জন্ম থেকেই ঠকে এসেছি। অপর পক্ষে প্রকৃত খ্রীষ্টানদের দেখুন, মানে ইউরোপের খ্রীষ্টানদের দেখুন—তারা কখনও এক গালে থাপড় খেয়ে আর এক গাল পেতে দেয়নি। বরং উল্টে চড়দাতার দুটো গালই ধসিয়ে দিয়েছে। এবং আরো দেখুন, যিশু বলেছিলেন—'উটের পক্ষে সূচের ফুটো দিয়ে প্রবেশ করা সম্ভব হলেও ধনীর পক্ষে স্বর্গে যাওয়া কদাচ সম্ভব নয়।' এর চাইতে মিথ্যে কথা কী আছে! প্রত্যেকটা ধনীই দেখি দিনরাত স্বর্গে বিচরণ করে বেড়ায়, আর গরীবের পক্ষে ডাস্টবিনের মুখ দিয়েও নিচে গলে যাওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং বাইবেলের এত বড় দুটো প্রতারণাময় উপদেশের জন্য বাইবেল আমি পছন্দ করি না।

বিচারক মাথা চুলকে আবার কি একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা, আপনি কখনও মসজিদে গিয়েছেন?

—না।

—ছুন্নত হয়েছে আপনার?

—না।

বিচারক এবার ভয়ানকভাবে মাথা চুলকে উঠলেন, তাহলে, তাহলে তো আপনাকে কোন ধর্মের মধ্যেই ফেলা যায় না!

কে একজন পাশ থেকে বলে উঠলেন, মনুষ্য ধর্মের পর্যায়ে ফেললে কেমন হয়?

বিচারক বললেন, না। বিচারের ধারায় মনুষ্যধর্মের কোন স্থান নেই।

সমস্ত বিচারকক্ষটাই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকল। আমার সাক্ষী সেই প্রথম লোকটিকে দেখলাম প্যাটপ্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে, যেন বলছে, ব্রেভো ব্রাদার, ব্রেভো!

বিচারক অনেকক্ষণ কি ভেবে আবার মাথা তুললেন, চোখ ছুটো তার কেমন ঘোলাটে হয়ে এসেছে। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, ধর্ম-টর্ম চুলোয় যাক, আপনি ঈশ্বর মানেন তো?

বললাম, ঠাকুর্মা যখন বেঁচে ছিলেন মানতাম, এখন মানি না?

—কেন?

—কারণ আমার মা প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করে আমাদের অবস্থা দিনকে দিন খারাপ সময় ভাল করতে পারেন নি।

বিচারক বললেন, সে তো মূর্তিপূজার কথা। ঈশ্বর তো মূর্তিপূজার মধ্যে নেই! উপনিষৎ তাই কোন মূর্তির কথা বলেনি; বাইবেল বলেনি, কোরানও বলেনি।

আমি বললাম, তাহলে ঈশ্বর কোথায় আছেন বলুন?

বিচারক সামান্য একটু ঘাবড়ে গিয়ে তোত্‌লাতে লাগলেন, এই ধরুন, একটা অনুভূতির মধ্যে।

বললাম, আমার অনুভূতিতে কখনও ঈশ্বর ধরা পড়েন নি।

বিচারক বললেন, অত সহজ অনুভূতিতে তো তিনি ধরা দেন না। সাধনার দ্বারা মনকে নির্বিকল্প করতে হবে। সমস্ত সেন্সগুলোকে অসাড় করে দিয়ে অসীম শূন্যতার মধ্যে যেতে হবে।

বললাম, আমি যখন প্রথম চাকরি পেলাম, তখন প্রচুর মদ খেতাম। এবং অনেকদিনই আমার কোনরকম চৈতন্য থাকতো না। কিন্তু কোনদিন তো ঈশ্বর আমার কাছে আসেন নি! একদিন বরং একটা কনস্টেবল আমাকে ধরে থানায় নিয়ে গিয়ে বেদম পিটেছিল, এবং আমার পকেটের গোটা পঞ্চাশেক টাকা বের করে নিয়ে তবে আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। কনস্টেবল কি ঈশ্বর?

বিচারক আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, হাতের পেন্সিলটা অসীম

বিরক্তিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, না, এ অসম্ভব। তিনি বোধহয় পরামর্শের জন্য সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু এ সমস্যা থেকে কেউ কোন কিনারা দেখাতে পারলেন বলে মনে হল না। অগত্যা বিচারক নিজেই আমার দিকে তাকালেন, ওসব কথা থাক, হ্যাঁ, আপনার যেন নাম কি ?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সত্যিই নিজের নামটা মনে করতে পারলাম না, বললাম, নামটা আমার মনে নেই।

বিচারক কপালটা কুচ্‌কে ভয়ানক বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, আপনার মতন এমন বিরক্তিজনক ক্রিমিন্যাল আমি জীবনে দেখিনি। ঠিক আছে, ধরে নিলাম আপনার নাম 'আ'। তা তা মিঃ 'আ', আপনাকে আমি সরাসরি একটি কথা বলছি। আপনি ঈশ্বর মানুন বা না মানুন, আমাদের কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী ঈশ্বরের নামে আপনাকে শপথ নিতে হবে।

আমার সঙ্গের সেই প্রথম লোকটি, যে বিনা ফী-তে আমার উকীল হয়েছে, হঠাৎ এমন সময় দাঁড়িয়ে উঠে বলল,—ঈশ্বরকে না মেনে তাঁর নামে সত্য কথা বলবার শপথ নিলেও তার তো কোন মানে থাকবে না ধর্মাবতার!

বিচারক উত্তেজনায় হঠাৎ গায়ের কোটটা খুলে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, কোন কিছুরই মানে নেই। একটা ধারা, একটা নিয়ম, যুগের পর যুগ চলে আসছে, তাই মানতে হবে, ব্যস! এর মধ্যে আবার মানে খুঁজবার কি আছে! তিনি ডায়াস ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করলেন।

হঠাৎ এমন সময় দেখি, ফরিয়াদী পক্ষের উকীল উঠে দাঁড়ালো। আমি দেখেই চমকে উঠলাম—পার্কে দেখা সেই দ্বিতীয় লোকটি। সে বলল, ধর্মাবতার, আপনি বিচার না করেই চলে যেতে পারেন না।

বিচারক ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, কি করব, লোকটা যে ঈশ্বরের নামেও শপথ নেবে না ?

ফরিয়াদী উকাল বলল, তাই বলে তো একজন খুনী ছাড় পেয়ে যেতে পারে না। ভেবে দেখুন, কী সাংঘাতিক রকমের খুনী এ। আমাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, প্রাচীন ঐতিহ্য, সমাজব্যবস্থা সব কিছুকেই খুন করতে উদ্যত হয়েছে এ, একে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমাদের বিচারব্যবস্থায় ঈশ্বর একটা বড় অঙ্গ, ও মানুক, না মানুক তাতে কী এসে যায়! কারণ আমাদের ঈশ্বর যদি বেঁচে না থাকেন, তাহলে আমাদের এ-বিচার ব্যবস্থাও টিকে থাকবে না। সুতরাং আপনার, আমার, সকলের বাঁচবার জন্যই এর বিচার হওয়া উচিত। নিয়মমাফিক ঈশ্বরের নামে শপথ বাক্যটা কোর্টের করণিককে দিয়ে পাঠ করিয়ে দিন। তারপর এ ধরনের অপরাধীর বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত কি, এ তো সকলের জানাই আছে।

আমার সাক্ষী সেই যে প্রথম লোকটি, যে এখন আমার উকীল, সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ধর্মাবতার, আমি এ-ধরনের মন্তব্যের প্রতিবাদ করছি। বিচারের সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নেই হতে পারে না। কারণ, আপনি জানেন যে, খুন করলেই লোকে খুনী হয় না। সমস্ত কিছু নির্ভর করে মোটিভেশন-এর উপর।

ফরিয়াদী পক্ষের উকীল বলল, এ হল একটি নির্মম হত্যাকাণ্ড। এর পেছনে একটাই মাত্র মোটিফ থাকতে পারে, তা হল নিছক হত্যার স্পৃহা। লোকটি জাত খুনী।

আমার উকীল বলল, আমি বলছি, সারকামস্টান্স তাকে খুন করতে বাধ্য করেছে।

—কি রকম ?

—নিহত লোকটি সরকারী অফিসের কয়েকটি লুকানো ফাইলের উপর বসেছিল।

—তাতে কি হল ?

—সেই ফাইলগুলি এদের কলেজের ফাইল। সেগুলি না হলে এরা টাকা পাচ্ছেন না, সেজন্য যথেষ্ট অনটনে দিন কাটাচ্ছেন ভদ্রলোক।

—সরকারী অফিসের ফাইল কিছুদিনের জন্য বাইরে বিশ্রামের প্রয়োজনে যেতেই পারে। তাছাড়া সেই মেয়েটির গলায় পা দিয়ে চেপে ধরেছিল লোকটি—এটেম্পট টু মার্ডার।

—কিন্তু মেয়েটি অনেকগুলো বেবিফুডের কৌটোর উপর বসেছিল।

—তাতে কি হল ?

—অথচ এই দুধের অভাবে ভদ্রলোকের ছেলে কয়েকদিন অনাহারে আছে।

—ভদ্রলোকের স্ত্রীর স্তনে যদি দুধ না থাকে সেজন্য···

—পর্যাপ্ত খাবার পায় না বলেই স্তনে দুধ থাকে না।

—কেন পর্যাপ্ত খেতে পান না ?

—মার্কেটে আর্টিফিসিয়াল ক্রাইসিস। সুতরাং যা মাইনে পাওয়া যায়, তাতে কুলোয় না এবং তার পরে যদি ফাইল উধাও হয় ··

বিচারককে দেখলুম, কোন কথা শুনছেন বলে মনে হচ্ছে না। আপন মনে ফড়ফড় করে একটা কাগজের মধ্যে কি লিখে চলেছেন। তিনি লেখা শেষ করতেই আমার উকীল বলল, ধর্মাবতার, আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা···

বিচারক গম্ভীর মুখে বললেন, না, আপনার কথা শুনিনি।

—তাহলে বিচার হবে কি করে ?

বিচারক গম্ভীরভাবে বললেন, এ-সব ক্ষেত্রে বিচারের রায় পূর্বাহ্ণেই স্থির হয়ে থাকে।

—কি রকম ?

—হত্যা করলে খুনীর ফাঁসী।

আমার উকীল বলল, কিন্তু যারা তিলে তিলে মানুষকে হত্যা করছে ?

—বিচারে তাদের কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেই। তিলে তিলে হত্যা করাকে 'খুন' বলা চলে না।

—তাহলে ?

—আমি আমার রায় দিচ্ছি।

—রায় !

—হ্যাঁ ! আমি নিশ্চিত যে, এই লোকটি খুন করেছে, সুতরাং আমি এর ফাঁসীর নির্দেশ দিলাম।

আমার উকীল উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল যেন, এ-সিদ্ধান্ত হলে আমি উর্ধ্বতন আদালতে আপীল করব।

বিচারক বললেন, আপনার সে স্বাধীনতা আছে।

আমার উকীল সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় ফোনের ডায়ালে নখ ঢুকিয়ে দিয়ে জোরে জোরে ঘুরিয়ে দিল। তারপর রিসিভারটা কানের কাছে তুলে ধরল। কিছুক্ষণ মাত্র, তার মুখে হাসি ফুটল।

বিচারকের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে বলল, ধর্মাবতার, আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আমি উর্ধ্বতন আদালতে বিচার প্রার্থনা করেছি।

ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বিচারক বললেন, ভাল, সেখানেই বিচার হবে।' তিনি ডায়াসের পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমি ওধার থেকে অস্পষ্টভাবে তাঁর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, মদ নয়, মদে হবে না। বড় বেশী রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছি, উত্তেজনা হ্রাস করা দরকার। সেই যে মেয়েটি।

তাকিয়ে দেখলাম, বিচারকক্ষ প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। ধুপ্-ধাপ্ ধুপ্ধাপ্ শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে। লোকগুলো সব বোধহয় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। আমার উকীল কাছে এসে বলল, আসুন, কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসুন। ফাঁসী দেওয়া এতই সহজ ! উপরের আদালতেও আমি দেখবেন সব আটকে দেব। তারপর তার উপরে এবং তারপর তারও উপরে।

ভয়ে ভয়ে বললাম, সারা জীবনই এ-ধরনের বিচার চলবে নাকি ?

সে বলল, তা চলতে পারে।

—তবে ?

—ভয় কি ? এর নামই তো জীবন। একটা বড় রকমের ফাঁদ, এ-থেকে বেরুতে হবে।

—কেউ কখনও এ-থেকে বেরুতে পেরেছে ?

—জানি না।

—তবে ?

—তবে আর কি ? ফাঁসীর হুকুম মাথার উপর নিয়ে তো বসেছিলেন, এতদিনে সেটা ধরতে পেলেন। এটা এক ধরনের রোগ, জানেন না ? প্রত্যেকের মধ্যেই গোপন আছে। কৌতূহল নিয়ে খোঁচাখুঁচি করলে সবাই দেখতে পাবে, তাদের মাথার উপর ঝুলছে ফাঁসীর দড়ি। কোন চিন্তা নেই, চলুন আমি সঙ্গে আছি। আমাকে হাত ধরে কাঠগড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে লোকটা চলতে আরম্ভ করে দিল।

আবার সিঁড়ি সামনে, ওটা বেয়ে উঠতে হবে। উর্ধ্ব আদালত উপরের তলায়। ভয়ানক ক্লান্ত লাগছিল। পা দুটো টেনে টেনে তবু উপরে উঠতে লাগলাম।

উপরে ওঠবার সিঁড়িগুলো এবার ক্রমশ সরু হয়ে গেছে, এবং তুলনামূলকভাবে অনেকটা খাড়া। অদ্ভুত একটা কুয়াশা সমস্ত সিঁড়ি জুড়ে। এরই মাঝে দেয়ালে ঝোলানো গণ্ডারের চামড়ার কিছু ঢাল দেখা যায়। আড়াআড়ি করে ধারালো ইস্পাতের অনেকগুলো তরওয়ালও টাঙানো। এক্স-এর মত সেই আড়াআড়ির মাথায় একটা করে এমবাম করা মানুষের মাথা। উপরে লেখা : বিচার জয়ের ট্রফি ! মাঝে মাঝে কোথা থেকে কালো কালো কিছু বাদুড় এবং চামচিকে এসে সেই মাথাগুলোর উপর বসে কি শুঁকে যাচ্ছে ! নতুন তলার মেঝেতে পা দিতেই দরজার উপরে লেখা দেখলাম - ডেনজার এ্যাহেড। সাবধানে গাড়ি চালাইবেন। অলকনন্দা এখান থেকে ·· মাইল। শুধু মাইলের দূরত্ব কতটুকু, বোঝা গেল না। অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

উপরে প্রথমেই যে করিডরে উঠলাম সেটা রাইটার্সের করণিকদের করিডরের মত। অসংখ্য পুরনো কাগজের গন্ধ চতুর্দিকে। পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে এদিকে ওদিকে ইঁদুর। লোকগুলো কলম হাতে ঘাড় গুঁজে বসে আছে, লিখছে কিনা বোঝা যায় না। কোন দিকে মাথা তুলছে না, আশ্চর্য ব্যাপার!

দুই দিকেই অসংখ্য টাইপরাইটারের টকাটক শব্দ হচ্ছে। অসংখ্য পঙ্গপাল সবুজ মাঠে বসলে যে-রকম শব্দ হয় সেইরকম। কোথা থেকে শব্দগুলো উঠছে বোঝা যায় না।

সেই প্রথম লোকটা, অর্থাৎ এখন যে আমার উকীল, সে আমাকে একটা ছোট সেরেস্তাখানায় নিয়ে গেল। অসংখ্য ফাইল লাল ফিতেয় বাঁধা। চারদিকের সেল্‌ফে অসংখ্য আইনের বই। আমার উকীল ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আমার সিনিয়র, এত বড় অ্যাডভোকেট এ-কালে আর দেখা যায় নি। আমি বুক-সেল্‌ফগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম: বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, ষড়্‌দর্শন, শঙ্করাচার্যের ভাষ্য, রামানুজ, এমনকি বাৎসায়ন এবং চরক সংহিতা পর্যন্ত উপস্থিত। এ ছাড়া আছে, বাইবেল, কোরান, অভেস্তা, কনফুসিয়স, ত্রিপিটক, সক্রিটিসের আলোচনা, প্লেটো, আরিস্টটল, কান্ট, হেগেল, নীট্‌শে, কিয়ার্কেগার্ড, হাইডগার, জেসপার, শেক্‌সপীয়র, গ্যেটে, রুশো-ভলতেয়ার, রবীন্দ্রনাথ, সার্ত্রে, কামু ও কাফ্‌কা। মাওৎ-সেতুং-এর রচনাবলীও আছে।

একজন ক্লার্ক আমার উকীলকে বলল, অ্যাডভোকেট এখন নেই, উপরতলার আদালতে গেছেন। সেখানে ঝড় ওঠবার কথা, সেখান থেকে সুপ্রীম কোর্টে যাবেন, আদপে কোন দিন ফিরবেন কিনা বলে যান নি।

আমার উকীল তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চটপট কোথায় বাইরে চলে গেল। একটা কাঠের বেঞ্চে বসে ছিলাম, তার অসংখ্য ফাঁকে বিচারপ্রার্থীদের রক্ত খাওয়া অসংখ্য ছারপোকা, কুটকুট করে

কামড়াচ্ছিল। আমার পাশেই একটি মেয়ে ইংরেজী বই হাতে নিয়ে বসেছিল। সে যত না বই পড়ছিল, তার চাইতে বেশী বড় বড় চশমার ফাঁকে আমাকে তাকিয়ে দেখছিল। চর্বি কমে যাওয়া বৃষ্টি ধোঁয়া একটা গন্ধরাজের মত শরীর। কয়েকবার প্রসব করবার পর সৌখিন মেয়েদের শরীরে এইরকম একটা স্নিগ্ধতা দেখা দেয়। তথাপি তাদের ব্রেসিয়ারে আঁটা বুকগুলোকে স্থলপদ্মের মত মনে হয়। পাকা পেয়ারার মুখের মত নাভি থেকে তখনও গন্ধ ছড়ায়।

মেয়েটির হাতের বইয়ের মলাটের দিকে তাকালাম, টাইটেল—'হাউ টু স্যাটিসফাই পিওর সেক্স ক্রেভিং'। বইয়ের প্রথম পাতাটাই পড়ছিল সে। প্রথম লাইনেই লেখা আছে, 'সেক্স ইজ দি মোস্ট নন-আর্টিফিসিয়াল ইনার সেল্ফ অব এ ম্যান'। আমি ভদ্রমহিলার বইয়ের মলাটের দিকে যখন তাকিয়ে আছি, একটা বকুল ফুলের মত তার বাঁ হাতটা আমার কোলের উপর ঝরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত দিয়ে তার নরম হাতখানা জড়িয়ে ধরলাম আমি। তারপর নরম কাঁঠালী চাঁপার মত আঙুলগুলোকে ঘষে ঘষে দিতে লাগলাম। আশ্চর্য! মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুতে লাগল যেন সেই হাত থেকে। তখন আমার নাভির কাছে সেই পোকাগুলো আবার কিল্‌বিল্ করে উঠল। মহিলাটি আরও একটু কাছে সরে এলেন আমার, এবং তখন একটা গরম লেপের মত মনে হতে লাগল তাকে। আলসের ধোঁয়ার মত একটা অদ্ভুত গন্ধ উঠতে লাগল তার সমস্ত দেহ থেকে। আলতো করে ডান হাতটা দিয়ে তার পিঠ ঘিরে ধরলুম। তার স্থল-পদ্মের মত নরম বুকে আমার আঙুলগুলো সেতারের তারে খেলতে লাগল যেন। খুব অস্পষ্ট করে ভদ্রমহিলার গলা দিয়ে একটা আহ্লাদি বেড়ালের মত ঘড়ঘড় শব্দ উঠতে লাগল। আমি আস্তে আস্তে তার কানে কানে বললাম, তুমি এখানে কি কর?

সে আর একটু কাছে সরে এল আমার। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কিচ্ছু না! এমনিই এখানে বসে থাকি, আর এইসব বই পড়ি।

—কেন ?

—কারণ পৃথিবীতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কোন ব্যক্তি নেই।

কথার মধ্যে কিছুটা যেন হেঁয়ালী আছে, স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে দুটো স্নিগ্ধ ঠোঁট আমার গালে যেন আলপনা এঁকে দিল। কানে কানে শুনতে পেলাম, তোমার মত এমন স্নিগ্ধ মানুষ···

আমি বললাম, আমার মনে হয় তুমি বিবাহিতা ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে ?

সে বলল, আমার মনে হয় তুমিও বিবাহিত ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে ?

—হ্যাঁ, সেইটেই বড় ভাবনার কথা, তাহলে এমন হয় কেন ? অথচ দেখ, বিবাহিত মহিলাদের আমার বড় ভাল লাগে। তাদের মধ্যে কেমন একটা স্নিগ্ধতা আছে। তাদের শরীরের মধ্যেও কেমন স্নিগ্ধ গন্ধ। তাদের জড়িয়ে ধরলেও বুকে আগুন জ্বলে না, কেমন স্নিগ্ধতা অনুভব করা যায়।

মহিলাটি বলল, আমারও বিবাহিত ভদ্রলোকদের ভাল লাগে, কারণ তারা সবাই অভিযুক্ত। সংসারে না ঢুকলে অভিযুক্ত হওয়া যায় না, এবং সংসারে না ঢুকলে লোকে স্বপ্ন দেখে, এবং স্বপ্ন দেখা মানেই জীবনের বাইরে থাকা। যারা জীবনের বাইরে থাকে তাদের কি জীবনওয়ালা মানুষের ভাল লাগে ?

আহা! যেন দোয়েল পাখির মত কণ্ঠ মহিলাটির, স্নিগ্ধ আকর্ষণে ভরা। গলার কাছটায় ধুক্‌ধুক্‌ করছে স্নিগ্ধ স্পন্দন, থাইওরেড গ্ল্যাণ্ড। আমি সেখানটায় চুমু খেলাম।

সে বলল, জীবন ফুরিয়ে যাবার আগে মধুর হয়, তাকে নিঃশেষে পান করো।

বললাম, হ্যাঁ, আমার মনে হয় সেইটেই সত্য। মাঝখান থেকে ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে দিয়ে গেল দাড়িওয়ালা লোকদের কয়েকটা পুরনো উপদেশ।

খিল্‌খিল্‌ করে মিষ্টি হেসে উঠল মহিলাটি, মজার কথা কি জানেন—ঐ রকম অনেক বুড়ো শেষ বয়সে আমার কাছে আসতো, তখন তাদের কী কান্না!

—কেন?

—জীবনে যে রস নেই, নিংড়ে আর বের করতে পারে না। মনকে ঠারিয়ে চলার মত প্রতারণা নেই। শেষ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় না, কাঁদতে হয়।

ভয়ানকভাবে জড়িয়ে ধরে মহিলাটিকে চুমু খেলাম। আহা! যেন ইজিপ্টের এক বস্তা স্নিগ্ধ তুলো! বুকের স্থলপদ্মে মাথা রেখে ঘুমোতে ইচ্ছে হল আমার। কোথায়, কোন্ ঘরে যেন মৌমাছির গুঞ্জরণ হচ্ছে। তার মধ্য থেকে কে হাঁকছে, আসামী হাজির!

শব্দটা শুনতেই 'আমি বিচারাধীন আসামী' সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। তখন মহিলাটির স্নিগ্ধ চুলে মুখ রেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমাদের এই অ্যাডভোকেট খুব বড়?

—হ্যাঁ।

—সব কেসই ইনি জেতেন?

—না। কোন কেসই তো তাকে জিত্‌তে দেখিনি?

—তাহলে? তাহলে বড় কিসে?

—তিনি যে সারা জীবনভরে সংগ্রাম করছেন সেইজন্য।

—এখানে কি কোন অ্যাডভোকেটই কোন কেস জয় করেন নি?

—না।

—তবে?

—ভাবছেন কেন। কোন কেসেই কেউ কখনও জয়লাভ করে না।

—তাহলে ?

—এখানকার এইটেই হল মজা। এর মধ্যে যারা দাগী আসামী তাদের মর্যাদাই হল সব চাইতে বেশী।

—আসামীর মর্যাদা বেশী! সেকি কথা! আমি অবাক হয়ে মহিলাটির দিকে তাকালাম। সে বললে, হ্যাঁ, কারণ জীবনের প্রতি যারা শক্রতা করে তারা এখানে জ্ঞানী এবং গুণী লোক। কিন্তু যারা জীবনটাকে ভালবাসে এবং তাকে রক্ষা করতে চায় তারা সবাই শত্রু হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং আসামীর কাঠগড়ায় তাদেরই দাঁড়াতে হয়।

মহিলাটির কথা শেষ হতে না হতেই দূরে কোথায় হাঁক শোনা গেল—মিঃ আ, আসামী হাজির ?

শব্দটা কানে যেতেই আমি চমকে উঠলাম। এ যে আমারই নাম! তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। মহিলাটি তখন আরও একটু জড়িয়ে ধরে আমাকে চুমু খেল। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ভয় পেয়ো না, এবং বিচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা কোর না, কারণ একমাত্র দুর্নীতিপরায়ণ কাপুরুষেরাই বিচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। এবং নতি স্বীকার করে আমাকে অনাথা কোর না, কারণ আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

আমার হাতে তখনও স্থলপদ্মের নরম, এবং বুকের কাছে একটা গরম লেপের উষ্ণতা। কিছুতেই ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না আমার। কিন্তু সেই মুহূর্তেই আমার উকীল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল আমার কাছে: কই, এখনও দাঁড়িয়ে কেন, চলুন। সময়মত না গেলে পাওয়া যাবে না। বিচারক ফাইল নিয়ে বসে আছেন, এখনি আমি সওয়াল শুরু করব। আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে গেল সে।

ঘন একটা সন্ধ্যা যেন চারদিকে। কিংবদন্তির মত একটা কুয়াশা। সেই কুয়াশার মধ্য দিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

দুটো পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরে কাঠগড়ার মধ্যে ঠেলে দিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম—বিচারক কয়েক হাজার পাতার একটা ফাইল ফড়্‌ফড়্‌ করে উল্টে যাচ্ছেন। বুঝতে পারলাম, এ সবই আমার মামলা সম্পর্কিত নথিপত্র। সামনে দাঁড়িয়ে ছায়া ছায়া অসংখ্য মুখ দেখলাম—সেই ইউ. জি. সি অফিসের কেরানীর মত সব মুখ। নিষ্পলক সব চোখের তারা, যেন সন্ধ্যার আকাশে মঙ্গলগ্রহ। আসামী পক্ষের উকীলকেও দেখলাম—সেই পার্কের দেখা দ্বিতীয় লোকটি। সবগুলো চোখই ভাষাহীনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে।

বিচারক তেমনি মাথা নিচু করে ফাইল দেখছেন। একটি কেরানী বাইবেল, কোরান ও গীতা হাতে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, ঈশ্বরের নামে শপথ করুন।

সত্যি, আমার মাথায় যেন কিছু ঢুকছিল না। বললাম, ঈশ্বর! সে আবার কে?

বিচারক নিবিষ্ট মনে ফাইল দেখছিলেন, হঠাৎ চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললেন। কেরানীটি তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, ধর্মাবতার, এ নাকি ঈশ্বরকে চেনে না।

বিচারক আবার চশমা লাগিয়ে আমার দিকে তাকালেন, আপনি ঈশ্বরকে চেনেন না?

কপাল টিপে অনেকক্ষণ ভাববার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ যেন আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, চিনি।

—তিনি কোথায় থাকেন বলুন তো?

বললাম, আমাদের বাড়ির পাশে পুকুরের ধারে পুজোর পর পোঁদ উল্টে পড়ে থাকেন।

সমস্ত হলে একটা উত্তেজিত চাপা গুঞ্জরণ উঠল।

বিচারক চোখ দুটো পাথরের মত করে আমার দিকে তাকালেন।

কি ভাবলেন কে জানে। বললেন, ধরুন তাই, কিন্তু সে ঈশ্বরকে কি আপনি মানেন না ?

—না।

—কেন ?

—কারণ সে ঈশ্বর এক ধরনের লুণ্ঠক।

—কি রকম ?

—মস্তানদের ছাড়া তাঁর চলে না।

—অর্থাৎ ?

—মস্তানরা তাঁর নামে জোর জুলুম করে চাঁদা তোলে। ক্ষমতাহীন লোকদের কাছ থেকেও তারা ট্যাকসো আদায় করে। সুতরাং এমন নিপীড়ক ঈশ্বরের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।

আবার সমস্ত কক্ষে একটা গুঞ্জরণ উঠল। বিচারক চোখ দুটোকে আরো পাথরের মত করে ফেললেন। তারপর কি ভেবে আবার টেবিলের উপরে রাখা ফাইলটার কয়েকটা পৃষ্ঠা ওল্টালেন, লাল পেন্সিল দিয়ে বেশ কিছু জায়গায় আণ্ডারলাইন করলেন, তারপর আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, আপনি নিম্ন আদালতেও ঈশ্বর সম্পর্কে এই ধরনের কটূক্তি করেছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, তাঁর অসীম করুণাতেই আমরা বেঁচে আছি ? তিনি যদি না থাকতেন, রাজ্য চলত না, বিচারব্যবস্থা থাকত না।

—জানি।

—জানেন যদি, তাহলে ঈশ্বর সম্পর্কে আপনার এত কটূক্তি করবার সাহস হয় কোত্থেকে ?

—জানি বলেই কটূক্তি করি।

—কেন ?

—কারণ, তিনি আপনাদের ঈশ্বর। এই বিচারব্যবস্থার ঈশ্বর। এই শাসনব্যবস্থার ঈশ্বর। কারণ, তার বশংবদেরা বেবিফুডের

কৌটোর উপর বসে থাকে। কারণ, তার অনুচরেরা সরকারী অফিসের ফাইল লোপাট করে দেয়।

বিচারকের পাশে দাঁড়ানো কেরানীটি খুব আস্তে করে বিচারককে বলল, ইনকোহেরেণ্ট। দেখতে পাচ্ছেন কোন সঙ্গতি নেই! সাইন অব্ ইনস্যানিটি।

বিচারক বললেন, তাহলে তো মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে ওকে বেকসুর খালাস করে দিতে হয়?

কেরানীটি বলল, তাই দিন স্যার, নইলে কোর্টে ও একটা সিন্ ক্রিয়েট করবে।

হঠাৎ সেই দ্বিতীয় লোকটি অর্থাৎ ফরিয়াদী পক্ষের উকীল যেন পেছনে তাতানো লোহার সেক খেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল: ধর্মাবতার, ও পাগল নয়। সেয়ানা পাগল, ভয়ানক ডেনজারাস। ওকে কোনরকমে খালাস দেবার কথা চিন্তা করবেন না। অনেক ক্ষতি করে দেবে?

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, কি ধরনের ক্ষতি?

ফরিয়াদী উকীল বলল, ও আমাদের সভ্যতাকে আঘাত করবে, আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে আঘাত করবে, আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে আঘাত করবে। সব চাইতে বড় কথা, আমাদের ধর্মকে আঘাত করবে, যে ধর্মের উপর ধরুন আমি আপনি সবাই বেঁচে আছি।

বিচারক বললেন, কিন্তু কি করা যায়! ও যে কোর্টে ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণই করছে না!

—তাতে কি এসে যায়? এ জন্যেই তো ওর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।

—হতে পারে, কিন্তু আপনি তো জানেন যে, আমরা কাউকে শাস্তিই দেই আর অব্যাহতিই দেই, সবই আমরা সেই মহান ঈশ্বরের নামেই করি?

ফরিয়াদী উকীল খানিকক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, মি লর্ড, যে কারণে আপনি ওকে শাস্তি দিতে পারেন না, সেই কারণেই আপনি ওকে অব্যাহতিও দিতে পারেন না।

—কি রকম ?

—ওকে শাস্তি দিলেও যেমন আপনি তাকে ঈশ্বরের বিধান বলে চালাতে পারবেন না, তেমনি অব্যাহতিই বা দেবেন কার নামে ? ঈশ্বরের করুণার নামে ? তাও তো হবে না, কারণ ও কোন ঈশ্বরকেই মানে না।

—'হুম !' বিচারক দুই হাতে কপাল টিপে ধরে গুম হয়ে ভাবতে লাগলেন। কি ভাবলেন কে জানে। হঠাৎ তিড়িক করে মাথাটাকে উপরের দিকে তুলে ধরলেন। দেখতে পেলাম তার চোখদুটো জ্বল-জ্বল করছে। তিনি কেরানীটির দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, আমি একটা বুদ্ধি বের করেছি, পাগলটা বোধহয় এবার ঠকে যেতে বাধ্য হবে।

কেরানীটি তার বাঁ কানটাকে বিচারকের দিকে আরো ঠেলে নিয়ে গেল। বিচারক তাকে কি যেন বললেন। কেরানীটির মুখেও হাসি ফুটল।

বিচারক আমার দিকে তাকালেন, আপনি তাহলে সত্যি সত্যি ঈশ্বর মানেন না ?

—না।

—আচ্ছা, যদি বলি মানুষ-ঈশ্বর মানেন ? তাহলে ?

—না।

—কেন ?

—মানি না কারণ, মানুষ, মানুষ, তার সঙ্গে অর্থহীন একটা শব্দ 'ঈশ্বর' যোগ করার কোন মানে নেই।

বিচারক বললেন, কিন্তু ব্যাকরণগতভাবে এর একটা মানে আছে।

বললুম, ব্যাকরণ চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়। সমাজব্যবস্থা পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ব্যাকরণগত অর্থেরও পরিবর্তন ঘটতে পারে।

এই সময় ফরিয়াদী পক্ষের উকীল দাঁড়িয়ে উঠে বলল, মি লর্ড, আমি আগেই বলেছি, ও বড় ভয়ঙ্কর আসামী, ওর সঙ্গে…

বিচারক চোখ রাঙিয়ে উঠলেন ফরিয়াদী উকীলের দিকে, আমি যখন কথা বলব, ইনটারফেয়ার করবেন না, এটাই রীতি।

—'সরি মি লর্ড!' ফরিয়াদী পক্ষের উকীল বসে পড়ল।

বিচারক আবার আমার দিকে তাকালেন,—কিন্তু দেখুন মিঃ আ, আমাদের অনেক মনীষী ব্যক্তি মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এই ধরুন বিবেকানন্দের কথা—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার…'

বললাম, জানি স্যার,…

কেরানীটি বাধা দিয়ে বলল, বিচারককে 'ধর্মাবতার' বলে সম্বোধন করতে হয়।

বললাম, আমি যে শব্দের অর্থ বুঝি না, সে শব্দ উচ্চারণ করি না।

—কি রকম?

—ধর্ম কাকে বলে যে, ওঁকে ধর্মাবতার বলব?

—যা ধারণ করে রাখে, তাই ধর্ম।

—আপনারা কি ধারণ করে রাখছেন?

—কেন, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, আইন…

—কাদের সমাজ? কাদের সংস্কৃতি? কাদের ধর্ম? কাদের আইন?

—মানুষের।

—কোন্ মানুষের?

—কোন্ মানুষের আবার! দ্বিপদ, দ্বিহস্তযুক্ত যে জীব, সেই মানুষের কথা বলছি।

—দুই পা, দুই হাত তো শিম্পাঞ্জীরও আছে।

এই সময় বিচারক হঠাৎ হেসে ফেললেন। বললেন, শিম্পাঞ্জী বা বাঁদরেরা মানুষেরই পূর্বপুরুষ, তা জানেন তো ?

— জানি। কিন্তু তাই বলে তারা মানুষ নয়।

এমন সময় ফরিয়াদী উকীল আবার লাফিয়ে উঠল, বলেছি মি লর্ড, ওর সঙ্গে তর্ক করে পারা যাবে না !

বিচারক আবার তাকে ধমকে উঠলেন, আপনি থামুন।

এই সময় কেরানীটি আমাকে বলল, শিম্পাঞ্জী নয়, আপনার মত হাত-পাওয়ালা মানুষের কথাই বলছি আমি।

—কোন্ ক্যাটেগরির ?

—মানুষের আবার ক্যাটেগরি আছে নাকি ?

—কেন নেই ? ধনী আছে, দরিদ্র আছে, সৎ আছে, প্রতারক আছে···

বিচারক বললেন, থাক, অত তর্কে দরকার নেই। দেখুন, আমাদের দেশের একজন কবি বলেছেন—'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' একথা বিশ্বাস করেন তো ?

—করি।

হঠাৎ বিচারক মাথা চুলকে উঠলেন, বললেন, 'সরি ! না, এতে হবে না, কারণ এর মধ্যে ঈশ্বরযুক্ত নেই।' তিনি আবার পেন্সিলের পেছনটা দাঁত দিয়ে কামড়াতে লাগলেন।

ফরিয়াদী উকীল আবার উঠে দাঁড়াল। বলল, ধর্মাবতার, ওকে নানাভাবে শাস্তি দেওয়া যায়। সব চাইতে বড় অভিযোগ, ও কনটেম্পট অব্ কোর্টের দায়ে দায়ী। সুতরাং এই একটি গ্রাউণ্ডেই তো ওকে খতম করা যায় ! হেন কথা কখনও শুনিনি যে, মি লর্ডকে একটা আসামী ধর্মাবতার বলবে না। ওকে শাস্তি দিন মি লর্ড।

বিচারক বললেন, শাস্তি দেবার তো আমার ইচ্ছে, কিন্তু কার নামে দিই ?

ফরিয়াদী উকীল বলল, ধর্মাবতার, ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে

ইউরোপের দেশগুলিতে একটা রেওয়াজ ছিল যে, শাসক যে-ধর্মের হতেন সমস্ত প্রজাবর্গকেও সেই ধর্মাবলম্বী বলে ধরা হোত। যেমন ধরুন, ইংলণ্ডেশ্বরী যখন ছিলেন মেরী, যেহেতু তিনি ক্যাথলিক ছিলেন, ক্যাথলিক স্পেনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের মৈত্রীয় সম্পর্ক স্থাপিত হল। কিন্তু যেই এলিজাবেথ সিংহাসনে বসলেন, তিনি প্রটেস্টাণ্ট ছিলেন বলে সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ক্যাথলিক স্পেনের শত্রুতার সম্পর্ক হয়ে গেল।

বিচারক বললেন, আপনি এর দ্বারা কি বোঝাতে চান?

ফরিয়াদী উকীল বলল, আমি এর দ্বারা এই বোঝাতে চাইছি যে, কোন দেশের শাসকের ধর্মই যদি জাতির ধর্ম হয়, তাহলে আদালতে বিচারকের ধর্মই বা কেন বিচারপ্রার্থীদের ধর্ম হবে না? বিচারকের চোখে একটা আলো ফুটে উঠল। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনার কথাটার যুক্তি আছে বটে, সুতরাং···

সঙ্গে সঙ্গে আমার উকীল লাফিয়ে উঠে বলল, ধর্মাবতার আমি অবজেকশন দিচ্ছি।

—কেন?

—দেখুন সেকালে দেশের শাসকেরা জনমত না নিয়েই দেশের জনগণকে নিজেদের ধর্মাবলম্বী বলে মনে করতেন। জনমত নেবার পক্ষে কোন সংবিধানও ছিল না। কিন্তু আদালতের যখন একটি বিশেষ ধরনের সংবিধান আছে, অর্থাৎ সাক্ষী বা সাক্ষীর অভাবে আসামীকে ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে হয়, তখন···

বিচারক হতাশ ভঙ্গীতে দুই হাত তুলে বললেন, তাহলে আমি কী করব বলুন?

আমার উকীল বলল, অন্তত যতদিন পর্যন্ত আইন-সংক্রান্ত সংবিধান পরিবর্তন না হচ্ছে, অর্থাৎ মানুষের নামে শপথ নেবার প্রথা প্রচলিত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এ-ধরনের মামলা কোন কোর্টে উঠতে পারে না। সুতরাং···

বিচারক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, অসম্ভব, ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষকে এনে বসানো যায় না। তাহলে সমস্ত সভ্যতা ধসে পড়বে, সমাজ ভেঙে যাবে, সংস্কৃতি নষ্ট হবে। অসম্ভব।

আমার উকীল বলল, মি লর্ড, তাহলে এই ভদ্রলোকের বিচার আপনি কার নামে করবেন?

বিচারক বললেন, মানুষই ভগবান। সুতরাং আমাদের-আসামী যখন মানুষে বিশ্বাস করে, তখন ধরে নিতে পারি যে, সে ঈশ্বরেও বিশ্বাস করে। সুতরাং আদালতের কেরাণী শপথ বাক্য পাঠ করে যাবে, এবং আমি ধরে নেব যে, আসামীর তাতে সায় আছে, এবং সেই ভাবেই…

আমার উকীল বলল, মি লর্ড, সেটা এক ধরনের জোর-জবরদস্তি হবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে আমি…

—বলুন।

—আমি উর্ধ্বতন আদালতে আপীল করতে বাধ্য হব।

বিচারক বললেন, সে অধিকার আপনার আছে। আপনার যা খুশি করবেন। এখন আমাকে আমার বিচার করতে দিন।

বিচারক পাশে অপেক্ষমান কেরানীটিকে চোখের ইশারায় কি যেন ইঙ্গিত করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কেরাণীটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে তিনটি ধর্ম পুস্তকের উপর একখণ্ড চিরকূট রেখে তা থেকে গড়গড় করে পড়ে গেল: ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে সত্য বই মিথ্যা বলিব না।

সঙ্গে সঙ্গে বিচার আরম্ভ হয়ে গেল। ফরিয়াদী পক্ষের উকীল, অর্থাৎ সেই দ্বিতীয় লোকটি, চিরুনী দিয়ে নিজের মাথাটা আঁচড়ে নিয়ে সওয়াল করতে আরম্ভ করে দিল: মি লর্ড, অভিযুক্ত আসামী সমাজের পক্ষে একজন ভয়ানক ক্ষতিকর ব্যক্তি। পুলিশের ডায়েরী থেকে জানা যায়, আইবি ডিপার্টমেন্ট নীরবে বহু দিন যাবৎ এই লোকটিকে অনুসরণ করে আসছিল। লোকটি এতদিন চাপা স্বভাবের

ছিল। কিন্তু পুলিশ জানতে পেরেছিল যে, এর মনে অনেকগুলি সমাজবিরোধী চিন্তা কাজ করছে। সেইজন্য ধরতে গেলে এক ধরনের নজরবন্দীই করে রেখেছিল একে। লোকটি এতদিন বস্তিতে বাস করত। বস্তিবাসী কি ধরনের নোংরা ও ক্রিমিন্যাল মানসিকতার হয়, মি লর্ড তা ভাল করেই জানেন। এবং সে যখন এই সভ্য এলাকায় প্রবেশ করল, তখনই চাইনিজ দোকানে একটা ষাঁড়ের মত ব্যবহার করতে লাগল। দেখুন, অকারণে এই লোকটি···

আমার উকীল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অকারণ কথাটা ক্ল্যারিফাই করুন।

ফরিয়াদী উকীল ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, অকারণ মানে যার কোন কারণ নেই।

আমার উকীল বলল, মি লর্ড, আমার বন্ধুটি বলছেন যে, অকারণ মানে যার কোন কারণ নেই। কারণটাকেই তো মোটিভ্ বলা চলে। কোন মোটিভ্ ছাড়াই যদি কোন লোক কোন কাজ করে, তবে তাকে অ্যাবনরমাল বলে ধরে নিতে হয়, যাকে বলে পাগল। সে-ক্ষেত্রে···

দেখলাম, ফরিয়াদী উকীলের কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। পকেট থেকে পর পর তিনটি রুমাল বের করে কপাল মুছল সে। তারপর সামান্য ইতস্তত করে বলতে লাগল, অকারণ মানেই যে কারণ নয়, তা বোঝাতে চাইনি আমি। অকারণ মানে এক ধরনের স্বভাবজ কারণ—

আমার উকীল উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ তুলল, ভাষার সংবিধান না পাল্টানো পর্যন্ত 'অকারণ' মানে কখনও 'স্বভাবজ কারণ' হতে পারে না। উনি যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন, তাকে বলা হয় ইন্‌স্টিংকট।

ফরিয়াদী উকীল বলল, দি আইডিয়া। আমি সে কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম।

আমার উকীল বলল, ইন্‌স্টিংকট দ্বারা চলে পশু। কিন্তু কোন আদালতে কোন পশুর কখনও বিচার হয়েছে কি?

ফরিয়াদী উকীল উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল, এ ধরনের পশুকে গুলি করে মারা উচিত।

আমার উকীল বলল, কিন্তু বিচারের কাঠগড়ায় ওঠানোর পরে কি বিনা বিচারে গুলি করা যায়?

ফরিয়াদী উকীল বলল, মি লর্ড, আমার বন্ধুটি অবান্তর তর্ক জুড়ে অপ্রয়োজনে সময় নিচ্ছেন। এইভাবে উনি একজন ক্রিমিন্যালকে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে চান।

বিচারক হস্তক্ষেপ করে আমার উকীলের দিকে তাকালেন। বললেন, আপনি ওকে বলতে দিন।

ফরিয়াদী উকীল তখন বলতে আরম্ভ করল, সভ্যজগতে প্রবেশ করে এই লোকটি একজন বিশেষ ভদ্রলোক—যিনি একজন সরকারী কর্মী, তাঁকে হাতুড়ির আঘাতে হত্যা করেছে। এবং একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলাকে যিনি উর্ধ্বতন সমাজের লোক, তাঁকে গলায় পা দিয়ে চেপে ধরে হত্যার চেষ্টা করেছে। পুলিশের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় নিহত লোকটির সঙ্গে তাদের ভাল যোগাযোগ ছিল এবং আহত ভদ্রমহিলাটির সঙ্গেও পুলিশের মধুর সম্পর্কের অভাব ছিল না। সুতরাং—

আমার উকীল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মি লর্ড, সমস্ত পরিবেশটা বিচার করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে। মনে রাখতে হবে যে, যে পরিবেশে আমার মক্কেল এই কাজ করেছেন, তাঁকে সেই কাজে প্রভোক করবার মত যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল।

বিচারক আমার উকীলের দিকে তাকালেন, কি রকম?

আমার উকীল বলল, যেমন ধরুন, সেই ভদ্রলোক সরকারী অফিসে আমার মক্কেলের কলেজের একটি হারিয়ে যাওয়া ফাইলের উপর বসে ছিল। এবং আমার মক্কেলের ছোট ছেলেটি যখন বেবি ফুডের অভাবে অনাহারে ছিল, সেই সময় ঐ মহিলাটি বেবিফুডের কৌটোর উপর বসে উপরোক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছিল।

ফরিয়াদী উকীল বলল, তাতে কি এসে যায়? কারণ, এ কথা তো সর্বজন বিদিত যে, মাঝে মাঝেই সরকারী অফিসের ফাইলগুলি বিশ্রাম করতে যায়। এবং বেবিফুডের কৌটোর উপর বসে থাকাটা কোন্ দিক থেকে অপরাধযোগ্য সেটা আমাদের মাথায় ঢোকে না। কারণ, গুদামঘরে যদি স্থানাভাব হয় তাহলে বেবিফুডের কৌটোর উপর অনেকেই বসতে পারেন।

আমার উকীল বলল, কিন্তু অনাহারে যখন শিশুরা মারা যাচ্ছে, তখন বেবিফুড জমা হয়ে থাকা কি অপরাধ নয়?

ফরিয়াদী উকীল বলল, মানুষ যদি কিনতে না পারে, তাহলে বেবিফুড জমবেই। সেজন্য অপরাধ কার?

আমার উকীল বলল, কিন্তু টাকাকড়ির ফাইল যদি সরকারী অফিস থেকে উধাও হয়ে যায়, তাহলে লোকে সময়মত কিনবে কি করে?

বিচারক হস্তক্ষেপ করলেন। বললেন, আপনাদের তর্ক যেভাবে চলছে, তাতে এ-তর্ক কোনদিন শেষ হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং আমাকে কোর্টের প্রসিডিংসগুলো একটু দেখতে দিন। তাছাড়া আইনের বইও একটু ঘেঁটে দেখা দরকার।

তিনি পার্শ্ববর্তী কেরানীকে কি যেন ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেরানীটি মঞ্চের পেছনের দরজা দিয়ে কোথায় ঢুকে গেল। তারপরই আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, অবিশ্বাস্য রকমের বড় বড় কয়েকটা ধেড়ে ইঁদুর, মাথায় করে বয়ে নিয়ে এল একটি অবিশ্বাস্য রকমের বড় বই। সেই বইটি বিচারকের টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ইঁদুরগুলি কান নাড়তে লাগল এবং বিচারকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। বিচারক হাতের আঙুলে একটা তুড়ি দিতেই ইঁদুরগুলি সুড়সুড় করে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। বিচারক অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে তাঁর আঙুলগুলির সাহায্যে ফড়্‌ফড়্ করে বইয়ের পাতাগুলি উল্টে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে সবগুলি পাতাই তিনি উল্টে ফেললেন।

তারপর গম্ভীরভাবে মুখ তুলে আমার উকীলের দিকে তাকালেন। হুতোম প্যাঁচার মতো অজস্র মুখ গোল গোল চোখ মেলে সেই প্রথম থেকেই বিচারকের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের চোখগুলো আরও বড় হল। বিচারক বললেন, আমি আইনের বই এবং কোর্টের প্রসিডিংসগুলো ঘেঁটে দেখলাম। বহু সরকারী ফাইল উধাও হয়ে যাবার নজীর আছে। কিছুদিন বিশ্রাম করবার পর সেই ফাইলগুলির মধ্যে অনেকগুলিই আবার আত্মপ্রকাশ করে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে, অর্থের অভাবেই এই ফাইলগুলি মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে যায়। অবশ্য তাদের বক্তব্য, সিলভার টনিক পেলে বিশ্রামের জন্য ডুব দেবার কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ, একালের বিজ্ঞান বিশেষ রকমে বিশ্লেষণ করে নাকি জানতে পেরেছে, সিলভার টনিকের চাইতে স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং ফাইল বিশ্রাম করতে গেলে সেজন্য কাউকে বিশেষ রকমে অভিযুক্ত করে শাস্তি দেওয়া চলে না। এবং এরকম কোন শাস্তির নজির কোর্টের প্রসিডিংস-এ নেই। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীরা ব্যস্ততার দরুন চিনির বস্তা, চালের বস্তা বা তেলের টিন কিংবা বেবিফুডের কৌটোর উপর বসতে পারেন। পিনাল কোডের ধারায় সেটা গণনাযোগ্য অপরাধ নয়। সুতরাং কোন ব্যবসায়ীর পত্নী, কন্যা, বা ফিয়াসেঁ এইসব জিনিসের উপর বসলে তারও অপরাধ হয় না। অপরপক্ষে কোন ব্যক্তি যদি বিচারালয় দ্বারা অপরাধী প্রমাণিত নয় এমন কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেবার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন, বা প্রচলিত ঈশ্বর, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, আইন বা প্রশাসনকে আঘাত করেন, তাহলে তাকে শাস্তি দেবার অফুরন্ত অবকাশ আছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণ না করে কেউ যদি প্রতিবাদ করেন তাহলে সেটাও আইনত দণ্ডনীয়। সুতরাং এমত অবস্থায় নিম্ন আদালতের বিচারসংক্রান্ত নথিপত্র, পুলিশের সাক্ষ্য, আসামীর ব্যবহার প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করবার পর আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি

যে, আসামী প্রকৃতই অপরাধী এবং বর্তমান সমাজে অহেতুক অবাঞ্ছিত ব্যক্তি, কারণ, সে ধর্ম বা ঈশ্বর, বা আইনস্রষ্টাদের আইন, কোনটাই মানে না। সুতরাং এমত অবস্থায় আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হচ্ছি যে, আসামী প্রকৃতই অপরাধী। এবং নিম্ন আদালতে তার সম্পর্কে ফাঁসীর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই ন্যায়সঙ্গত ও আইনসিদ্ধ। সুতরাং আমিও সকল দিক বিবেচনার পর মঙ্গলময় ঈশ্বরের নামে এবং সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির কল্যাণে এই ফাঁসীর দণ্ডাদেশ বহাল রাখিতেছি।

এইটুকু বলেই বিচারক উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার উকীলকে কোনপ্রকার তর্কের অবকাশ না দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। চারদিকে শব্দ উঠল—সাধু! সাধু! ফরিয়াদী পক্ষের উকীল পকেট থেকে বড় একটা সন্দেশের বাক্স বের করে কার দিকে বাড়িয়ে ধরল। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম—সেই ইউ. জি. সি অফিসের কেরানী শাণ্ডিল্য চ্যাটার্জী। আমার দিকে তাকিয়ে সে ফিক্‌ফিক্ করে হাসল। ফরিয়াদী উকীলের মুখ আবার দেখি লম্বাটে সেই নেকড়ের মুখের মত হয়ে গেছে। দুটো ধারালো দাঁত মুখ থেকে বেরিয়ে পড়তে চাইছিল। সে দুটোকে খুলে সে পকেটের ভিতর রেখে দিল। সেই সুইমিং কস্টিউম পরা মেয়েটিকে দেখলাম চালুনির মত দুটো বড় বড় কালো কাঁচের গগল্‌স পরেছে। বুক দুটো যেন ভূমিকম্পে আরো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দুটো গোলাপের পাপ্‌ড়ি ঠোঁটে ঘষে সে আমার দিকে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তুমি দেখতেই সুন্দর, আসলে মনটা তোমার সুন্দর নয়। না হলে ভদ্রসমাজের আইন-কানুন, কোনটাই তোমাকে আজ পর্যন্ত বশ মানাতে পারেনি। ইউ আর জাস্ট লাইক এন ওয়াইল্ড বিস্ট। ওয়াইল্ডনেস আমি পছন্দ করি। কিন্তু সমাজ, ধর্ম, ঈশ্বর বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয়, শুধুমাত্র সেক্স লাইফের ক্ষেত্রে। তুমি যদি এখনও আমাদের সমাজে আসতে পারতে তাহলে তোমাকে কত যে

ভালবাসতুম! তুমি লেখাপড়া জান, তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি আমাদের কত উপকারে লাগতে পারো। যাই হোক, বাই বাই, টা টা। হাত নেড়ে মেয়েটি চলে গেল।

আমার উকীলের মুখখানা দেখি ধ্যানী বুদ্ধের মত হয়ে গেছে। দুই চোখ একটা টেলিফোনের বড় ডায়ালের উপর নিবদ্ধ। পাগলের মত ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে সে শুধু ডায়াল ঘোরাচ্ছে। ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর—

আমি তখনও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। দুটো কালো পুলিশ ঝাপটে ধরে আমাকে নিচে নামালো, তারপর কালো একটা কাপড় দিয়ে চোখ দুটো বেঁধে দিতে গেল। এমন সময় আমার উকীল চিৎকার করে উঠল, থাম। ওর গায়ে হাত দেবে না, উর্ধ্ব আদালতে আমি আবেদন করেছিলাম, আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। সুতরাং ও এখনো বিচারাধীন। নতুন করে বিচার আরম্ভ হবে, ওকে ছুঁয়ো না।

পুলিশ দুটোকে দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে গিয়ে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ জানালো আমার উকীলকে। তারপর পায় পায় পিছু হঠতে হঠতে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমার উকীল এগিয়ে এসে আমার হাত ধরল, চলুন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়?

সে বলল, উপরের আদালতে।

—আরো আদালত!

—হ্যাঁ।

—এর শেষ হবে কবে?

—কেউ বলতে পারে না।

—এখানেও যদি বিচারের নিষ্পত্তি না হয়?

—অন্য আদালতে যাব।

—কত আদালত আছে?

—জানি না। আমি নিজেই বা কয়টা দেখেছি, বলুন। শুনেছি,

অজস্র আদালত, এবং অনবরত এইসব আদালতের প্রাঙ্গণ পেরুতে হয়।

—তাহলে ?

—তাহলে কিছু নেই। আদালতে যখন একবার এসেছেন তখন শেষ না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করে যেতেই হবে।

—তার মানে সেই সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত ?

আমার উকীল বলল, সুপ্রীম কোর্ট আমি কখনও দেখিনি। আমার সিনিয়র উকীলকে বলতে শুনেছি, তিনিও কখনও দেখেন নি। আদপে সুপ্রীম কোর্টে কেউ কখনও যেতে পেরেছে কিনা জানি না।

—তাহলে ?

—তাহলে কিছু নেই। এইভাবেই চিরকাল সবাই এগিয়েছে, এবং আমাদেরও এগুতে হবে। নিন, আর কোন প্রশ্ন করবেন না। আসুন। সে আমাকে হাত ধরে উপরের দিকে টেনে টেনে তুলতে লাগল।

যেন দিন নিভে গেছে, এ সিঁড়িতে এরকম অবস্থা। এমন ভয়ানক আলস্য জড়ানো অন্ধকার যে, ভাবাই যায় না। তার উপর আবার সিঁড়িটা যেমন খাড়া, তেমনি অপ্রশস্ত। সিঁড়ির আনাচে-কানাচে অসংখ্য মাকড়সার জাল। যেন ফসফরাস দিয়ে তৈরী মাকড়সার জাল—এই অন্ধকারের আলস্যের মধ্যেও সেগুলোকে স্পষ্ট দেখা যায়। অদ্ভুত সব মাকড়সা, লম্বা লম্বা পা দিয়ে জাল বুনে চলেছে। আশ্চর্য ! আমাদের দেখে কয়েকটা মাকড়সা যেন অকারণে হিহি করে হেসে পথ থেকে সরে দাঁড়ালো।

অন্তত আড়াই ফুট করে লম্বা এক একটা টিকটিকি দেয়ালের গায়ে। যেন মানুষের গন্ধ শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন ভাব। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই লাইন বেঁধে কয়েকটা টিকটিকি আমাদের দিকে মুখ করে অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছনে ছোট ছোট বাচ্চা টিকটিকিরা কয়েকটা মানুষের পা নিয়ে কামড়া-কামড়ি করছে।

যত উপরে উঠছি, ততই সিঁড়িটাকে পিচ্ছিল মনে হচ্ছে। মনে হয়, সূর্য বোধহয় এখানে দিনরাত ঘুমোয়। তবুও পায়ের নিচে বিড়বিড় করছে অসংখ্য জীবন। কিন্তু ভয়ঙ্কর রকমের অসংখ্য শেওলা। যে-কোন সময় পা হড়কে পড়ে যেতে পারি।

কোথায় অনেক দূরে কে যেন চোঙা ফুঁকছে—'আসামী হাজির!' আকাশের কোন ফাঁকা অংশ থেকে যেন শব্দটা ভেসে আসছে, এমন ভাব। আমাদের অনেক উপরে কিছু লোক হেঁটে যাচ্ছে বলে মনে হয়, অত্যন্ত সাবধানী পদচারণা।

আমার পা কাঁপছিল। বুকের ভেতর ঢিব্‌ঢিব্‌ শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যে-কোন সময় পা হড়কে পড়ে যেতে পারি! মনে হচ্ছিল, কোন একটা বিশ্বাসে ভর করতে পারলে যেন এতটা দুর্বল বোধ করতাম না। কিন্তু বিশ্বাস কোথায় পাব? কোন ল্যাবরেটরীতে তো পরীক্ষা করে বিশ্বাস তৈরী হয়নি। ভেজাল বিশ্বাসে আরো ক্ষতি হতে পারে, যেমন ভেজাল ট্যাবলেট খেয়ে বহু লোক অজীর্ণে ভুগছে। এর চাইতে হোমিওপ্যাথিক ভাবে চলা ভাল, লক্ষণ দেখে অনুমান করব। কিন্তু কোনটাই নিশ্চিন্ত নয়। লাগলে ভাল, না লাগলে অযথা সময় ব্যয়। ঘড়ির ডায়ালে ছক বাঁধা সময়, এর একটা যদি অকারণে ব্যয় হয়, অনেকটাই গেল।

পা-টা ভয়ানক কাঁপছে। একবার মনে হল – শেওলার উপর পা-টা হড়কে গেল। হাত কাঁপছিল, আমার উকীল কাকের মত নখে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল। সে বলল, মিঃ 'আ', ভয় পাবেন না। আনাড়ী বিচারক একটা সিদ্ধান্ত দেবে, আর সেটাই আমাদের মেনে নিতে হবে, এটা কোন কথা নয়। আপনি দেখবেন, আমরা যদি আর একটু উঠতে পারি, তাহলে ফরিয়াদী পক্ষের উকীলটা এতদূর আর আসতেই পারবে না। আর, তাছাড়া এখানে আমার সিনিয়র অ্যাডভোকেটকে পেয়ে যেতেও পারি। তাঁর অভিজ্ঞতা আমার চাইতে অনেক বেশী। এইসব বিচারকরা

তাঁকে ভয় পায়। তিনি অনায়াসে বিচারক হতে পারতেন। কিন্তু বিচারক হওয়া মানেই কতকগুলি স্থির বিশ্বাসের আসনের উপর বসা। আর এগিয়ে যাবার উপায় থাকে না। বিচারক হতে গেলে সুপ্রীম কোর্ট অবধি যাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে তিনি এগিয়ে গেছেন।

আমি বললাম, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তবু আমি এগুচ্ছি, চলুন।

আমার কথার জবাব পাবার আগেই সামনে একটা 'দড়াম' করে শব্দ হল। মনে হল, একটা দরজায় কার কপাল ঠুকে গেল। আমি আমার উকীলকে বললাম, কি হল ?

সে বলল, কপালটা আমার ঠুকে গেল।

—কোথায় ?

—বুঝতে পারছি না। আপনার পকেটে কোন দেশলাই আছে ?

বললাম, ছিল। তবে কাঠি আছে কিনা জানি না।

—দেখুন।

পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, দেশলাই আছে। নেড়ে মনে হল একটিই কাঠি আছে। বললাম, একটি মাত্রই কাঠি আছে।

সে বলল, দিন।

দেশলাইটা আমার উকীলের হাতে বাড়িয়ে দিলাম।

ঠুক করে দেশলাইয়ের খোলে কাঠিটা ঠুকে আলো জ্বালাল আমার উকীল।

দেখলাম, সত্যি সামনে একটা দরজা। উপরে একটা বিজ্ঞাপন : বিশেষ কারণে আদালত বন্ধ থাকবে। মিঃ 'আ'র বিচার নথিপত্র দেখে করা হল। নিম্ন দুই আদালতের সিদ্ধান্তই বহাল থাকল। পুলিশের রিপোর্ট এবং কোর্ট প্রসিডিংস দেখে আমরাও তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসীর আদেশ দিচ্ছি। তবে মিঃ 'আ' যদি মনে করে, উপরের আদালতে আপীল করতে পারে।

দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল। আমি বললাম, তাহলে ? আমার উকীল বলল, বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা আপীল করব।

আমি বললাম, কিন্তু ভয়ানক অন্ধকার। উপরের আদালতে যাবার পথ কোন্‌টা?

আমার উকীল বলল, আমি দেখে নিয়েছি। বাঁ দিক দিয়ে এগুতে হবে। ভয় পাবেন না, দেয়াল হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে এগিয়ে চলুন। এ-পথে আমাদের সিনিয়র অ্যাডভোকেটের দেখা পেয়ে যেতে পারি। তাছাড়া, যদি আমরা ফাঁসীর আদেশ মাথায় নিয়ে চলতে পারি, তাহলে ঐ দড়িটা যে আমাদের ছুঁতে পারবে না এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত।

বললাম, কিন্তু—না, না, যত কষ্টই হোক আমি উঠব, চলুন।

উকীল বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চলতে হবে। সে আমাকে খুব সাবধানে টানতে টানতে উপরে নিয়ে চলল।

বাঁ দিকের এ সিঁড়িটা কি ধরনে তৈরী কিছুই অনুমান করা যায় না। ছোটবেলায় কার কাছে শুনেছিলাম বাঁ দিকের পথ চিরদিনই বড় জটিল। শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই এগুতে হয়। এবং সামনে আশা রাখতে হয়, কিছু একটা পাওয়া যাবে বলে। কিন্তু অসংখ্য অতীত বিশ্বাসকে পুরনো বাড়ির মতো ভেঙে ভেঙে ধসে পড়তে দেখেছি যে, সুতরাং নতুন কোন বিশ্বাসেই নিশ্চিত আস্থা স্থাপন করা কঠিন। আমি মনের মধ্যে খুব দৃঢ়ভাবে আস্থা আনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আস্থা আনব কোথা থেকে? শূন্যতার উপর কি কোন আস্থা চলে? মনের মধ্যে হাতড়ে দেখলাম—স্পষ্ট কোন রূপরেখা নেই। অনিঃশেষ কতকগুলো দীর্ঘ লাইন কোথায় যেন চলে গেছে। বিশ্বাসটা কি শুধুমাত্র চলা? শুধুমাত্র চলতে চলতেই কিছু পাওয়া যায়? না, চলার যে নিজস্ব একটা ছন্দ আছে, তাই জীবন? তাই একমাত্র অর্থ?

নতুন সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখলাম। কিছু একটা না ধরতে পারলে যেন পা রাখা যায় না। দেয়াল হাতড়াতে লাগলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য কলাকৌশলে তৈরি এই বাড়িটা! যত উপরে উঠছি

ততই যেন দেয়ালটা পাতলা হয়ে আসছে। খুব নির্ভর করে হেলান দিতে গেলে হঠাৎ কোন্ মহাশূন্যে ভেঙে পড়বে বলে মনে হয়। তাহলে? তাহলে বোধহয় পিঠটাও আর কোথাও রাখতে পারব না।

প্রতি পদক্ষেপেই দেয়ালটাকে পরীক্ষা করে করে হাত রাখতে লাগলাম। এমন রহস্যময় অন্ধকার আগে আর কখনও দেখিনি। ঘনকৃষ্ণ তমিস্রা নয়, অথচ আলোও নেই। এ কি আশ্চর্য ধরনের অন্ধকার কে জানে! যেমন পা কাঁপছে, তেমনি কাঁপছে হাত। নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দেয়ালে হাত রাখতে ভয় করছে। অথচ কিছু পাওয়া যাক্ বা না যাক্, নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে হাত তো রাখতেই হবে। রাখবার জন্য রাখা নয়, ধরে ধরে এগিয়ে যাবার জন্য রাখা।

দেয়ালে কতকালের সঞ্চিত ময়লা। বোঝা যায়, অনেক লোক এ-পথে যাতায়াত করেনি, তাই দেয়ালের গায়ে ঝুল পড়েছে, নোংরা জমে আছে। বোধহয় মাকড়সা জাতীয় কোন কীটের আশ্রয়ে হাত পড়ল। সেটা ধরে আর এক ধাপ উপরে ওঠবার চেষ্টা করতেই সেটা ছিঁড়ে গেল। পড়ে যাচ্ছিলাম, কোনরকমে ভেতর থেকে তুলে ধরে অসীম এক আত্মবিশ্বাসের চেষ্টাতে নিজেকে সামলে নিলাম। সেই মুহূর্তে হাতের নখে প্রচণ্ড দংশনে কি একটা যেন কামড়ে দিল। আমি বেদনায় অস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম।

আমার উকীলের দৃষ্টি শুধুমাত্র সামনে। তার হাত আমার হাতটা ধরে থাকলেও হয়তো তেমনভাবে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ আমার অস্ফুট শব্দ কানে যেতে সে একটু দাঁড়াল, হয়তো বা আমার দিকে ফিরে তাকাল, যদিও এখান থেকে পেছন ফিরে তাকানো প্রায় অসম্ভব।

সে বলল, মিঃ 'আ' আপনার কি হল? খুব কষ্ট বোধ করছেন?

বললাম, কষ্ট আছে, তবে তাকে অস্বীকার করবার জন্য চেষ্টারও আমার ত্রুটি নেই। কিন্তু সে জন্যে আমি চিৎকার করিনি।

—তাহলে ?

—আমার হাতে কিসে যেন দংশন করল। সমস্ত শরীরে জ্বালা বোধ করছি। বিদ্যুতের মত সমস্ত শরীরে আমার ব্যথা চিড়িক দিয়ে উঠছে।

আমার উকীল বলল, হ্যাঁ। আমার সিনিয়র অ্যাডভোকেটের কাছে আমি শুনেছিলাম যে, এ-পথ সাধারণত ব্যবহৃত হয় না বলে নানা রকমের কীট-পতঙ্গের আবাস। উর্ধ্বে ওঠার পথে এগুলো বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু মাটি থেকে এরা যত বিচ্ছিন্ন ততই এদের বিষে বেদনা থাকলেও ক্রিয়া কম। কারণ, ভাল বা মন্দ যা-ই হোক না কেন, মাটি থেকে রস আহরণ না করতে পারলে তার কোনটাই তেমন শক্তিশালী হয় না। সুতরাং আপনি ভয় পাবেন না। এ দংশন, আপনার মনে যদি সাহস থাকে, আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিন্, সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে উপরের ধাপে পা রাখবার চেষ্টা করুন।

বললাম, চেষ্টার আমার ত্রুটি নেই। শরীর অসম্ভব রকম ভারি হয়ে উঠেছে আমার। এক একটা তলাতে সিঁড়িগুলো এত দীর্ঘ যে, ভাবা যায় না। মনে হচ্ছে, এক একটা ধাপে পা ফেলতে যেন এক যুগ চলে যাচ্ছে। পা পাথরের মত ভারি হয়ে উঠছে ক্রমশ। হৃৎপিণ্ডটা যেন দেহের চাপে ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট বোধ করছি।

আমার উকীল বলল, হ্যাঁ, এইরকম হয় বলে আমার সিনিয়র অ্যাডভোকেট একবার আমাকে বলেছিলেন। তবু, এ সবকিছুকেই অগ্রাহ্য করুন, তাহলেই এগুতে পারবেন।

আমি বললাম, সামনে কোন নজির থাকলে ভরসা পাওয়া যায়। এ-পথে কি আগে কেউ কখনো চলেনি ?

উকীল বলল, খুব বেশী লোক না চললেও অনেকেই গেছেন। আমার সিনিয়র অ্যাডভোকেট তাদের মধ্যে একজন। তাছাড়া

জীবনকে যারা ভালবাসেন, ফাঁসীর দণ্ড এড়িয়ে যাঁরা মুক্ত এক পরিবেশের মধ্যে বাঁচতে চান, তাঁরা সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে এ-পথেই এগিয়ে যান। আমার মনে হয়, মাথার উপরে একটা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

একটু আশার সঞ্চার হল ভেতরে। জোর করে আর একটা পা সিঁড়ির আর এক ধাপে তুললাম। জীবনকে ভালবাসি; জীবন, শুধু জীবন, জীবন, জীবন। সুতরাং ফাঁসীর রজ্জু আমাকে এড়াতেই হবে। আমার উকীলের কথা শুনে—উপরের সিঁড়িতে কোথায় কোন্ অক্লান্ত বিচারপ্রার্থীর সঙ্গোপন পায়ের শব্দ হচ্ছে, তা বোঝবার জন্য কান পাতলাম। যেন কোন অজ্ঞাতলোকের এক হাওয়া শির্‌শির্ শব্দ করছে। সেই রহস্যময় পায়ের বহু দূর থেকে এক আশ্চর্য ধ্বনি উঠছে। যেন পুরনো এক মরুভূমির উপর হাওয়া চলছে বালি ছিটিয়ে।

পা ফুলে উঠেছে নিশ্চয়ই। আমি সেটা বেশ বুঝতে পারছি, কারণ আমার ইচ্ছার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে বৃদ্ধ এক বলদের মত কাঁপছে পা দুটো। তবুও অনেক কষ্টে একটা পা তুললাম। একটা ছুঁচো কিংবা ঐ ধরনের অজ্ঞাত কোন এক প্রাণী বোধহয় পায়ের নিচে পড়তে যাচ্ছিল, সেটা সরে গেল।

অন্ধকারের মত একটা গন্ধ পাচ্ছি চারদিকে। একটা দুর্বোধ্য অস্তিত্বের গন্ধ। অনেক হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে পরের ধাপে পা ফেলে আমার উকীলকে বললাম, সেই শব্দটা এখনও শুনতে পাচ্ছেন কি?

উকীল বলল, না। সম্ভবত পরের আদালতে সে গিয়ে পৌঁছে গেছে।

মনে হল, অনেক, অনেক, অনেক দূরে আদালতের একজন পিয়ন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে। নীল নীল হাওয়ায় মিশে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে সেই শব্দ আসছে, নিবিড় নিদ্রায় ঢলে পড়বার মুখে ঠাকুরমার সেই শ্রাবণরাত্রির গল্পের মত—আ—সা—মী হা—জি—র। উকীলকে বললাম, ডাক শুনতে পাচ্ছেন?

সে বলল, হ্যাঁ। তবে মনে হয় অনেক উপরের কোন ব্যাপার।

—সুপ্রীম কোর্ট?

—জানি না।

—তবে?

—বলতে পারব না।

এমন সময় শীতল একটা হাওয়ায় ভিজে রহস্যময় একটা ঝঙ্কার উঠল। মনে হল—রহস্যময় এক গোছা চাবি নিয়ে কে যেন বড় বড় অনেকগুলো তালা বন্ধ করে দিচ্ছে। উকীলকে বললাম, উপরের গেট বন্ধ হচ্ছে কি?

সে বলল, উপরে ওঠার পথের গেট কখনও বন্ধ হয় না বলেই আমার সিনিয়র অ্যাডভোকেটের কাছে শুনেছি।

—তাহলে এ শব্দ কিসের?

সে বলল, বলতে পারছি না।

আমার পায়ের নিচের অনুভবগুলো যেন হারিয়ে যাচ্ছিল এবার। মনে হল—পা উঠিয়ে আর একটা ধাপে ফেললাম। কিন্তু সত্যিই কোথাও পা রাখতে পারলাম কিনা বুঝে উঠতে পারলাম না। দেয়ালে হাত দিতে গিয়ে মনে হল—দেয়ালটাও সরে গেছে। হঠাৎ অনেক উপর থেকে নিচে পড়ে যাবার মুখে যেরকম অনুভব হয়, সেইরকম বোধ হল বুকের মধ্যে। মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো কেমন যেন হাল্কা হয়ে উঠেছে। আমার উকীল ঠিক সেই সময় থেমে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি থামলেন কেন? আমরা কোথায়?

উকীল বলল, সেই বড় বড় তালাগুলোর দেহে হাত পড়ছে বলে মনে হচ্ছে আমার।

ভয় পেয়ে বললাম, তাহলে কি দুয়ার বন্ধ?

সে বলল, আমি বিশ্বাস করি না। আলো নেই, দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমার মনে হয়—এ একটা নতুন আদালত। বন্ধ।

—তাহলে?

—আবার আমাদের এগুতে হবে।

—আবার!

—হ্যাঁ।

খুব বড় করে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করলাম। আমার পায়ের নিচে যে কোন বোধ নেই, এ কথাটা আমার উকীলকে আর বললাম না। যতক্ষণ মনের মধ্যে এক বিন্দু ইচ্ছা-শক্তিও থাকবে, ততক্ষণ তো চলতেই হবে। থেমে পড়া মানেই ফাঁসীর দড়ি গলায় এসে পড়া। না, জীবনকে আমি মৃত্যুর সীমানায় যতক্ষণ ইচ্ছা শক্তি আছে ততক্ষণ বাঁধতে চাই না। তাই আমার দৈহিক অসুবিধার কথা না বলে, আমি বললাম, এবার কোন্ দিকে যাবেন?

আমার উকীল বলল, বাঁ দিকে, কারণ আমার সিনিয়র অ্যাডভোকেট বলেছিলেন, জীবনকে যদি মর্যাদা দিতে হয়, তাহলে বাঁ দিকে চলাই বাঞ্ছনীয়। —আপনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

বললাম, না। শুধু দেখতে নয়, কিছু বুঝতে বা অনুভব করতেও পারছি না।

সে বলল, কিন্তু আমি আশা করতে পারি যে, আপনার মধ্যে ইচ্ছা-শক্তি এখনও জাগরিত আছে?

বললাম, হ্যাঁ।

—যতক্ষণ ইচ্ছা, ততক্ষণ জীবন। সুতরাং এগিয়ে আসুন। আমি আপনার হাত ভাল করে ধরছি। ভয় পাবেন না। হাতে আপনার বোধশক্তি আছে নিশ্চয়ই?

বললাম, সামান্য আছে। তাছাড়া ইচ্ছা-শক্তি তেমন দুর্বল হয়নি। আপনি আমার হাত ধরে টান দিন।

আমার উকীল আমাকে বেশ জোরে জোরে টানতে লাগল। আমি তার নির্দেশিত নিশানায় পা ফেলতে লাগলাম।

অদ্ভুত নৈঃশব্দ চারদিকে। অন্ধকারের মধ্যে এক অদ্ভুত রহস্যময় গন্ধ। আমার উকীলের হৃৎপিণ্ডের একক শব্দ আসছে আমার

কানে। আমার হৃৎপিণ্ডও চলছে, তবে খুব ক্ষীণভাবে। আমার উকীলের হৃৎপিণ্ডের শব্দের পাশে সেটা ডুবে যাচ্ছে।

মনে হল—অন্য একটা সিঁড়ির মুখে যেন নিয়ে এসেছে আমাকে আমার উকীল। নিঃশব্দে অনেক উপরে রহস্যময় কোন পথিক আছে বোধহয়। মনে হয়, অনেকক্ষণ পরে পরে তার এক-একটা ভারি পায়ে দীর্ঘ খস্‌খস্ শব্দ হচ্ছে। রহস্যময় হাওয়া, যেন কানকানি করে কথা বলছে কার সঙ্গে। সেই নিঃশব্দ কথা শোনা না গেলেও অনুভব করা যায়। নীল নীল গন্ধ পাচ্ছি নাকে। মনে হল—ভয়ঙ্কর বিরাট ছুটো পাখা মেলে একটা বাছুড় উড়ে গেল আমার ঠিক মাথা ছুঁই ছুঁই করে। আর তার সেই বিশাল পাখা থেকে অভূতপূর্ব কিছু রাত্রি ঝরে ঝরে পড়তে লাগল।

মনে হল—বহু দূর উর্ধ্বে জীবনের এক রহস্যময় ষড়যন্ত্র চলেছে। যেন কিছু লোক ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে বলে কাজ করছে। কি কাজ, কে জানে। কালো একটা মেরুপ্রদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন হাওয়া এসে অতি সুক্ষ্ম কিছু রেশমী চুল বুলাচ্ছে আমাদের কপালে। আর—কোন্ বহু দূর রহস্যময় জগতের কেন্দ্র থেকে যেন সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ভয়ানক মন্থর এক জলস্রোত নামছে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে।

মনে হল—সামনে আমাদের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক অন্ধকার। ভয়ানক শীতল স্পর্শযোগ্য অন্ধকার। তার মধ্য দিয়ে এসে কেমন এক উদ্বেল ঢেউ যেন গায়ে লাগছে। বুঝতে পারছি না, তবু মনে হয়—সিঁড়ি এখানে ভয়ানক খাড়া—ঠিক আকাশ বরাবর। হয়তো আরও কিছু উঠতে পারলে অনাবৃত আকাশ আছে। সেখানে হয়তো বৃষ্টি নামছে। সেই জল নিচে পড়ছে। আশেপাশেই কোথাও হয়তো ছিল, মনে হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর সাপ ; অকস্মাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে লেজ নাড়ছে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কণ্ঠ মনের কোন অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করল না। সেই সাপটা গায়ে লেজ আছড়াতে লাগল। আর—আমার মনে হতে লাগল—বহু নিচে

পৃথিবীর ধূলিমাটি ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই সাপের শীতল দেহ আমার উকীলের গায়েও লেগেছিল কিনা কে জানে। কারণ, সে বলল, ওটাকে কষ্ট করে শরীর থেকে ঠেলে ফেলে দিন। ঐসব নিম্ন আদালতের মত ওটা।

বললাম, ঠেলতে পাচ্ছি না যে! ক্রমশ যেন আঁটসাট হয়ে জড়িয়ে ধরছে!

উকীল বলল, কথাটা ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। মনটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিন। হয়তো আমরা আকাশ দেখতে পাব, এবং আকাশের বুকে নক্ষত্রের কোন অর্থহীন অসীম লেখা—

আমি কিছুকাল আগেই নীল আকাশের একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম নাকে। কিন্তু এখন চতুর্দিকে এত সূচীভেদ্য অন্ধকার যে, 'নীল' হয়তো বা একটা স্বপ্ন মাত্র।

ভয়ানক সাপটা পা অবধি জড়িয়ে ধরছে। কিছুতেই আর এগুতে পারছি না। আমার উকীলকে বললাম, আর যে চলতে পারছি না! ওটা আমার দুই পা জড়িয়ে ধরেছে।

উকীল বলল, আমি আমার সিনিয়র উকীলের কাছে শুনেছিলাম, যে, এইরকম হয়। কিন্তু তবুও এগিয়ে যেতে হবে কারণ, এগুতে পারলে তবেই হয়তো বা কোনদিন সুপ্রীম কোর্টের সাক্ষাৎ মিলতে পারে।

বললাম, কিন্তু আমি আর একটুও পা তুলতে পারছি না যে! আচ্ছা, তবু চলুন, চেষ্টা করছি।

হঠাৎ এমন সময় মাথার উপরে পায়ের শব্দ শোনা গেল; নিঃসঙ্গ দুটি পা যেন অনেক কষ্টে দেয়াল ধরে হাঁটছে। আমার উকীল চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি সিনিয়র অ্যাডভোকেট?

ক্ষীণ জবাব এল, না।

—তবে?

—শুনেছি উপরের তলাতেই তিনি আছেন, একটা বড় মামলা লড়ছেন।

—আপনি সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?

—না। তবে মনে হয়, অনেকক্ষণ কান পেতে থাকলে উপরের তলায় নিঃসঙ্গ হাওয়ার মত কখনও কখনও দু-একটি পায়ের শব্দ শোনা যায়।

আমার উকীল বলল, আপনার গায়ে কি কোন সাপ জড়িয়ে আছে ?

উপর থেকে জবাব এল, আছে। তবে কয়েক ধাপ এগিয়ে আসবার পর তার বন্ধনটা যেন একটু শিথিল হয়েছে বলে মনে হয়। আচ্ছা, আপনি কে ?

উকীল বলল, আমি মিঃ 'আ'র উকীল।

শব্দ এল, হ্যাঁ। এবার যখন আমার বিচার হচ্ছিল, তখন 'আ'র কথা শুনেছি।

উপরের পায়ের শব্দটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সাপটা ততক্ষণে এমন ভয়ানকভাবে জড়িয়ে ধরেছে আমার পা দুটো যে, কোনরকমেই আর এগুতে পারছিলাম না। উকীলকে বললাম, আমি আর সত্যই পা তুলতে পারছি না যে !

উকীল বলল, হ্যাঁ, তাইতো দেখছি। তবে আর কয়েকটা ধাপ এগুতে পারলে বোধহয় নতুন আদালতের সন্ধান পাওয়া যেত।

কিন্তু আমি তার কথার কোন জবাব দেবার আগেই—যেন কোন্ বহুদূর জগৎ থেকে একসঙ্গে অনেক মানুষের কলকণ্ঠ শোনা গেল। আমার উকীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও কিসের শব্দ ?

উকীল বলল, মনে হয় বহুদূর নিচে মাটি থেকে শব্দ উঠছে। মানুষের উল্লাসের শব্দ, বোধহয় বিচারের নতুন সংবিধান ঘোষিত হল।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, আর ফিরে যাওয়া যায় না ?

উকীল বলল, না। আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

—তাহলে ?

—আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। কিছু উপরেই আমার মনে হয় নতুন আদালত, আমি সেখানটায় দেখে আসি। সিনিয়র অ্যাডভোকেটের হয়তো সেখানে দেখা পেতে পারি। চেষ্টা পরিত্যাগ করবেন না।

বললাম, তাই যান। আমি এখানে চেষ্টা করছি। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই শুনেছি।

অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমার উকীল উপরের দিকে উঠে গেল।

সে উঠে গেলে, অনেকক্ষণ পরে, কোথায় একটা অন্ধকার পাথরের উপর দিয়ে ভয়ানক ঝর্ণার নিঃশেষ গুরুগম্ভীর কলনাদ শুনতে পেলাম। মহাকাশ, মহাবিশ্ব ভেঙে-চুরে যেন স্রোত নামছে। সমস্ত শরীরে রক্ত হিম হয়ে আসছিল আমার। ঝির্‌ঝির্‌ এক অদ্ভুত আলস্য আমার নিম্নাঙ্গ থেকে উর্ধ্বে উঠে এসে মাথায় আছড়ে পড়তে চেষ্টা করছিল। হাই উঠতে লাগল আমার, চোখ জড়িয়ে ঘুম এল। সিঁড়িতে মাথা রেখে শুতে ইচ্ছে হল আমার। কিন্তু মস্তিষ্কে তখনও অদ্ভুত এক ক্ষীণ চেতনা দাপাদাপি করছে। যেন বলছে, না, না, না, শু'লে চলবে না। সেই শীতল সর্পের বন্ধনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম পা তুলবার। আশ্চর্য ভারি বন্ধন। যেন বহুদিনের স্মৃতির পাতা খুলে দিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামতে চায়। কিন্তু তবু আমি পা ওঠাবার চেষ্টা করলাম উপরে। অন্ধকার, ঘন অন্ধকার সামনে। আমি সিঁড়ির ধাপ দেখবার চেষ্টা করলাম। এমন সময় মনে হল—অনেক উপর থেকে বিরাট একটা পা নামছে। আস্তে আস্তে সেই পা এসে যেন আমার মাথার উপর পড়ল। আমার সমস্ত স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক বোধহয় গুঁড়িয়ে গেল সেই নীল নীল চাপে। মিলিয়ে যাবার মুখে শেষ চৈতন্য কেঁপে উঠল—সুপ্রীম কোর্টের বিচারক ?
